সঙ্গ প্রসঙ্গ / গাফরুহা চৌধুরী

সঙ্গপ্রসঙ্গ

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

সঙ্গপ্রসঙ্গ

মাফরুহা চৌধুরী

www.pathagar.com

সঙ্গ প্রসঙ্গ
মাফরুহা চৌধুরী

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা
১৭১, বড় মগবাজার,ঢাকা-১২১৭
ফোন নং- ৪০২৪১০

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০০
মে ১৯৯৩
বাসাপ প্র-৪৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

মুদ্রক
মির্নাভা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

দাম
পঞ্চাশ টাকা

Sango Prosango
By Mafruha Choudhury

Published by
Abdul Mannan Talib
Director
Bangla Shahitta Parishad
171, Bara MaghBazar, Dhaka-1217

Price : Taka 50.00

www.pathagar.com

যুগন্ধর সাংবাদিক, বিদগ্ধ সাহিত্যিক
পিতৃপ্রতিম পূর্বসূরী
মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীন
পুণ্য স্মৃতি স্মরণে–

www.pathagar.com

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

১· অরণ্য গাথা ও অন্যান্য গল্প
২· কোথাও ঝড়
৩· স্খলিত নক্ষত্র
৪· বিদীর্ণ প্রহর
৫· নিঃশর্ত করতালি
৬· বিমূর্ত বৃত্তে
৭· মাফরুহা চৌধুরীর প্রেমের গল্প
৮· সব নিয়ে বসবাস
৯· ক্রান্তিকালের ছায়ায়
১০· ছায়া পথের মানচিত্র
১১· মাফরুহা চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প
১২· এক নয় সাত এক (উপন্যাস)

www.pathagar.com

সূচী পত্র

১.	কাছে থেকে জ্ঞান তাপস	৯
২.	মানবতাবাদী দার্শনিক	১৬
৩.	তিনি এখন স্মৃতি	২১
৪.	একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব	২৬
৫.	আনন্দ এবং বেদনা ছিল সঙ্গী	২৮
৬.	অন্তরে গাঁথা	৩৫
৭.	আমাদের ঋণ	৩৭
৮.	নক্ষত্র পতন	৪১
৯.	চোখ মুছিলে জল মোছেনা	৪৪
১০.	যাঁর মুখে ছিল শুধু জীবনের গান	৪৮
১১.	কথা ও চিত্র	৫০
১২.	নির্বাসনের পর	৫৮
১৩.	সাক্ষাৎকার	৬২
১৪.	অন্য ঠিকানা	৬৬
১৫.	অন্তরঙ্গে	৬৯
১৬.	জোয়ারী প্রাণ	৭৫
১৭.	দুঃসময়ে প্রস্থান	৭৯
১৮.	ব্যতিক্রমী শিল্পী সত্ত্বা	৮২
১৯.	ঘরে ঘরে তার প্রতিরূপ চাই	৮৫
২০.	উপেক্ষিত এক প্রতিভা	৯২
২১.	অবসিত বেদনা	৯৬
২২	নিভে যাওয়া তারুণ্য	৯৯
২৩.	রোমান্টিক স্মৃতির বৃত্তে	১০৪
২৪.	একজন বিশিষ্ট মহিলা	১০৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাছে থেকে জ্ঞান তাপস | ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

"অধুনাতনকালে বেদ অধ্যয়নে বিঘ্নিত হয়েও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাঙালী আচার্যদের শিরোমণি ছিলেন"- ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করেছিলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর এই মন্তব্যের পেছনে রয়েছে একটি ঘটনা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স পাশ করার পর এম, এ পড়ার জন্যে তৈরী হলেন। সংস্কৃতে এম, এ-এর পাঠ্যতালিকায় বেদ ছিল। বেদ পড়াতেন বৈদিক পন্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, কিন্তু তিনি একজন বিধর্মী ছাত্রকে বেদ পড়াতে রাজী হলেন না। সে সময়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। তাঁর অনুরোধের জবাবে পন্ডিত সামশ্রমী জানালেন, চাকরি থেকে পদত্যাগ করবেন তবু এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। স্যার আশুতোষ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কেই পরামর্শ দিলেন সংস্কৃতের পরিবর্তে কমপেরেটিভ ফিলসফি নিয়ে এম, এ পড়ার। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাই করেছিলেন। ব্যাপারটি মওলানা মোহাম্মদ আলী পরিচালিত 'Comrade' পত্রিকায় কয়েক সংখ্যাব্যাপী প্রকাশিত হয় The shahidullah Affair-এই শিরোনামে। 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' নামটি শিক্ষিত সমাজে প্রথম পরিচিত হয় তখনই।

এই ঘটনাটি প্রকাশ করেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কে তাঁর এক আলোচনায়।

এম, এ পাশ করার পর বি, এ, বি, এল পাশ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যশোরে প্রথম ওকালতি শুরু করেন। তাঁর আইন ব্যবসা সম্পর্কে স্যার আশুতোষ বলেছিলেন- Shahidullah, Bar is not for you. ''বাংলা সাহিত্যের কথা'' গ্রন্থটি স্যার মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ প্রসঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্। আশুতোষের এই মন্তব্য তাঁকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিলো আইন ব্যবসা ছাড়ার পক্ষে। আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন বাংলা বিভাগে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তখন তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করেন এবং এখান থেকেই পড়তে যান প্যারিসের সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে সময়ের প্রথম একজন মুসলমান যিনি ফরাসী দেশ থেকে ডি, লিট ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা ইন ফনেটিক্স লাভ করেন এবং ১৯৬৭ সালে এসে উপমহাদেশে

www.pathagar.com

প্রথম ফরাসী সরকার প্রদত্ত নাইট অব ডোমেইন ইন আর্টস এ্যান্ড লেটারস লাভের সম্মান অর্জন করেন।

শিক্ষা সমাজ জীবন রাষ্ট্রধর্ম দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর এই উপমহাদেশে একটি বিশেষ সময় ফলকের নাম 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'। চব্বিশ পরগণার পিয়ারা গ্রামে বাঙালী মুসলমান পরিবারে ১৮৮৫ সালে তাঁর জন্ম। গ্রামের সবুজ পরিবেশ, চড়াই-উতরাই পথ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিলো অনেক উঁচুতে উদার আকাশ আর তার বুকে খচিত উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে। উচ্চতায় পাঁচ ফুটের একজন মানুষ। এ বিষয়ে কেউ কিছু মন্তব্য করতে গেলে তিনি বলতেন- নেপোলিয়ন বেঁটে ছিলেন। কিন্তু তিনি জগৎ জয় করতে চেয়েছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তবে তিনি তাঁর গবেষণার কাজ করেছেন ১৯টি ভাষার সাহায্যে। উপমহাদেশে এ গৌরব অর্জন করেছেন খুব কম সংখ্যক পন্ডিত ব্যক্তি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যোগদানকালে সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষা একই বিভাগের অধীন ছিল। তিনি এই দুটি বিষয়ই পড়াতেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখন এই বিভাগের হেড্ ছিলেন। এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষকের দায়িত্বও দেওয়া হয় তাঁকে।

১৯৩৭ সালে বাংলাকে সংস্কৃত থেকে আলাদা বিষয়রূপে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তখন তিনি বাংলা বিভাগীয় প্রধান বা হেড-এর মর্যাদা পেলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমবারের মত অবসর গ্রহণ করেন ১৯৪৪ সালে। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ তিনি বগুড়ায় স্যার আজিজুল হক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। বগুড়ায় বসবাস করতে গিয়ে তিনি যেন জায়গাটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। বগুড়ার নবাব আলতাফ আলী চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার মূলে তাঁদের আদর্শগত বিভিন্ন বিষয়ে মতৈক্য। নবাববাড়ির মনোভঙ্গি তাঁকে শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক অনেক কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে, সহায়তা করেছে। আলতাফ আলী চৌধুরীর মাধ্যমে তাঁর বাবা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক এবং সমাজবিদ। ১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। সেখানে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে উর্দুকে শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনে পরিচিত করার সুপারিশ উত্থিত হয়। এই প্রস্তাবের সুপারিশে নওয়াব আলী চৌধুরী বিক্ষোভ প্রকাশ করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এমনি আরো অনেক ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক এবং সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম 'মৌলুদ শরীফ' রচনা করেছেন। মুসলমানদের সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে অনেক বই বাংলায় রচনা করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

বগুড়া আজিজুল হক কলেজের প্রিন্সিপাল থাকাকালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শিক্ষার প্রয়োজনীয় আয়োজনে একে সমৃদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট সময় এবং শ্রম দিয়েছেন। এর

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর এ্যাপারেটাস আনিয়েছেন কলকাতা থেকে। ১৯৪৭ সালের ঘটনা। বৃটিশ শাসকের কবল থেকে উপ-মহাদেশকে মুক্ত করার সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। সংগ্রামী আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল। কিন্তু জাতির যে মৌলিক প্রয়োজন শিক্ষা তার ভিত তৈরী করতে তিনি তখনো মশগুল। শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য ধর্ম ইত্যাদি যে কোন সভায় সম্মেলনে তিনি বার বার উচ্চারণ করেছেন- শিক্ষা। সবার আগে চাই শিক্ষা। এটা যেন ছিল তাঁর মোটো-আদর্শবাণী। কথাগুলো যেন এখনো কানে বাজে।

এই কলেজে মেয়েদের ভর্তির সুযোগ তাঁর সময়েই শুরু। প্রথম অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গে পড়ার ব্যবস্থা না করে মেয়েদের ক্লাস খোলা হয়েছিলো ডি, এম, গার্লস এইচ, ই স্কুলে। সকালে কলেজের ক্লাস হতো বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং তারপর শুরু হতো স্কুলের ক্লাস। কলেজটিকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা মেটাবার জন্যে তিনি গ্রাম-গঞ্জ থেকেও চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করেছেন। কোথাও কোথাও নিজে গিয়েছেন।

তিনি যখন বগুড়া কলেজের প্রিন্সিপাল আমি তখন ডি, এম, গার্লস স্কুলের ছাত্রী। আমাদের স্কুলের ক্লাস শুরু হবার বেশ আগে অর্থাৎ কলেজের ক্লাস শেষ হবার আগেই স্কুলে গিয়ে বসে থাকতাম তাঁকে দেখার জন্যে। ছোট্ট মানুষ। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন। চাপ দাড়ি, পরনে পুরোপুরি স্যুট, মাথায় তেলভেটের কালো টুপি। সব মিলিয়ে অত্যন্ত স্মার্ট এবং উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব।

কলেজে অল্প ক'জন ছাত্রী। ক্লাস শেষে স্কুল প্রাঙ্গণ পেরিয়ে তাঁর সঙ্গেই চলে যেত তারা। ক্লাস রুমের দীর্ঘ উঁচু বারান্দা দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির ধাপগুলো ভাঙতো তারা তাঁর পাশাপাশি কতরকম কথা বলতে বলতে। তিনি তাদের কথার জবাব দিতে দিতে এগোতেন। তাঁর গলার স্বর ছিল শান্ত অথচ দৃঢ়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দুই পাশে লনের মাঝখানে সরু পথ দিয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতো সবাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও অনেক কথার জবাব দিতেন। মনে হতো এখানেও তিনি যেন একটি ক্লাস নিচ্ছেন।

তাঁর কথা বলার সেই বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করেছি। গৌফের ফাঁকে কথাগুলো উচ্চারিত হয়ে বেরিয়ে আসতো। মৃদু হাসতেন যখন সামনের সাদা মুক্তোর মত উজ্জ্বল সুবিন্যস্ত দাঁতগুলো দেখা যেত। তিনি যে কত বড় পণ্ডিত তা তখনো বুঝিনি। তবে তিনি 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'-এটা বুঝেছিলাম এবং শিক্ষায় 'ডক্টর' হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, সারা বগুড়ায় আর কেউ তেমন ছিলেন কি না সেটা আমাদের জানার ভেতরে ছিল না। মনে মনে একটা স্বপ্ন ছিল, স্কুলের পাশ শেষ হলেই কলেজে যখন ভর্তি হবো, তখন এই মেয়েদের মত আমিও তাঁর ছাত্রী হয়ে তাঁর কাছাকাছি হতে পারবো এবং সে সম্ভাবনা আমার সামনেই। সেই আনন্দে মন ভরে উঠতো।

বগুড়ায় তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন। বগুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হবার জন্যে বাড়ি করেছিলেন, পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধুনটে জমি কিনে ক্ষেত খামার করেছিলেন এবং নিজেকে বগুড়াবাসী বলতে আনন্দবোধ করতেন।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে অদ্ভুতভাবে একটি ঘটনা ঘটলো। তালিম হোসেন ছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন। তালিম হোসেনের দাওয়াতে তিনি আমাদের বিয়ের বরযাত্রী হয়ে এলেন আমাদের বাসায়। এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অন্য কোন মৌলবী মওলানার পরিবর্তে নিজেই বিয়ে পড়ালেন। বিয়ের পর তিনি যে মোনাজাত করেছিলেন, শুনেছি তা ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তাঁকে বাড়ির ভেতরে আনা হলো কনে দেখাবার জন্যে। আমি তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। সালাম করে উঠে দাঁড়ালাম, তিনি আমার মাথায় অনেকক্ষণ হাত রেখে দোয়া করলেন। আমার বিয়ে হয়েছিলো ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পাবার পরে পরেই। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের কথা জেনে তিনি তখনই আমার অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করেন আমার উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে।

এরপর বেশ কিছুদিন চলে গেছে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বার বাংলা বিভাগের অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়েছেন। আমার পরম সৌভাগ্য তখন তাঁর কাছে পড়ার। তাঁর ক্লাসে প্রথম দিন, রোলকল করছেন। আমার রোল নম্বর আসতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে সবার দিকে তাকালেন। গোঁফের ফাঁকে স্মিত হাসি- বুঝলে হে! এর আমি বিয়েও পড়িয়েছি, এবার বিএ-ও পড়াচ্ছি।

ব্যাপারটি প্রথমে কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। ক্লাস শুদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতরে শুধু মৃদু গুঞ্জন। তিনি এবার সম্ভবত ফরাসী ভাষার উচ্চারণ প্রভাবিত আঁ শব্দ যুক্ত বাংলায় ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে বললেন, বুঝলে, আঁ, আমি ওর বিয়ের উকিল বাপ, আঁ! আমিই তো ওর বিয়ে পড়িয়েছি আঁ!.... এবার হাসির হুল্লোড়। উনি হাত তুলে থামালেন। থামলো সঙ্গে সঙ্গে সবাই। আমার জীবনের এমনি একটি ঘটনার সঙ্গে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন, এটা আমার জন্যে কত বড় গৌরব আর আনন্দের কথা! আমার জীবনের এ এক স্মরণীয় ঘটনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এবার থাকলেন ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। বিদায়ের সেই দিনটি মনে আছে। ক্লাসের শেষে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর সঙ্গে মিষ্টি খেলাম। জোর করে তাঁকে পরিবেশন করে খাওয়ালাম। আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর ছোট্ট অভিভাষণ হৃদয়ে গেঁথে নিলাম। কথা বলতে গেলেই এ্যাতো রেফারেন্স এসে যেতো তাঁর বক্তব্যে যে, একটা সম্মোহিত পরিবেশের সৃষ্টি হতো। এ্যাতো জানেন, অগাধ জ্ঞান আর তেমনি স্মৃতিশক্তি। জ্ঞানের পান্ডিত্যের বাণী অথচ অপূর্ব সরস অভিব্যক্তিতে তার প্রকাশ। তবে তাঁর আরেক বৈশিষ্ট্য যে, সরস বক্তব্য হলেও তাঁর প্রকাশ ভঙ্গি ঠিক ললিত নয়- একবারে কাটা কাটা। কিন্তু অত্যন্ত উপভোগ্য।

এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নেই এর বাংলা বিভাগের হেড্ এবং ডীন-এর পদে যোগ দেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সমস্যা। তাইস চ্যান্সেলর আই, এইচ জুবেরী ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সহযোগিতায় ধীরে ধীরে প্রাথমিক সমস্যাগুলোর সমাধানে সমর্থ হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

উপ-মহাদেশের বিশ্ববিশ্রুত বহুভাষাবিদ পন্ডিত শিক্ষক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র তিনিই এক সঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এখানে ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্টমেন্ট খোলা হলে ফ্রেঞ্চ পড়াতেন, ফিলসফি ডিপার্টমেন্টে কমপেরেটিভ রিলিজিয়ন, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খৃষ্টধর্ম, ইসলাম ইত্যাদি বহু ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ওপর তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখতেন।

তাঁর পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছে আমার। তাঁর গৃহে ছোট্ট যে কামরাটি ছিল একান্তভাবে তাঁর শয়ন, বিশ্রাম, নামাজের স্থান, সেখানে তাঁদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কাছাকাছি বসে কতরকম আলাপ কথাবার্তা শুনেছি, বলেছি। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে 'গুরুমা'র সম্পর্ক তিনিই বলে দিয়েছিলেন আমাকে। একদিন বললেন, অনেক টোটকা ওষুধ জানেন উনি। পারো তো শিখে নিয়ো। আসলে উনিতো একজন বড় হেকিম। ঠোঁটের ফাঁকে তাঁর স্বভাব সুলভ হাসি হেসে বললেন, ওঁর দাওয়াখানায় এলে গরু হারালেও গরু পাবে- বুঝলে না- আঁ!

স্ত্রী কটাক্ষের সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামালেন। পরিবেশটি উপভোগ করলাম, ষাটোত্তর বয়সের দু'জনের দৃষ্টির এই অভিব্যক্তি। স্ত্রীর প্রতি তাঁর মর্যাদাবোধ লক্ষ্য করেছি তাঁর কথায় এবং আচরণে।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র স্ত্রী জাতির ওপরেই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। একজন সমাজ সচেতন এবং সমাজ সংস্কারক মানুষ হিসাবে তাঁর অপলিত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের এটি একটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দু'চারজন মুসলমান মেয়ে ভর্তি হতেন সেকালে, তাঁদের প্রায় সবারই অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তিনি বহন করতেন। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন- শিক্ষার ক্ষেত্রে ছোট বেলা থেকেই শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বড় হবার পর তিনি সান্নিধ্য পেয়েছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের।

বহু ছাত্রের পৃষ্ঠপোষকতাও যেন তাঁর কর্তব্যের অংশ ছিল। মেধাবী বহু ছাত্রকে তিনি বাংলা বিভাগে পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অনেক ছাত্রকে ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জাগানোর যে মহৎ ঐতিহ্য, তার স্রষ্টা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান ভাষাবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর এক লেখায় বলেছেন "শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আকর্ষণেই ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স ক্লাসে ভর্তি হই। এবং মানুষ হই তাঁর স্নেহচ্ছায়ায়।" মুহম্মদ আবদুল হাই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ছিলেন আরবী এবং ইসলামী সংস্কৃতির ছাত্র। বাংলায় অনার্স পড়তে হলে সংস্কৃত এবং হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, স্বাভাবিক ভাবেই তা তাঁর ছিল না। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সহায়তায় সংস্কৃত ভাষা ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় জ্ঞানও আয়ত্ত করে ফেলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম একজন মুসলমান ছাত্র, বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স লাভ করেন এবং এম, এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন।

বহু ছাত্র-ছাত্রী নানাভাবে ঋণী হয়ে রয়েছেন তাঁর কাছে। তাঁদের কতজনের

www.pathagar.com

কতরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি। কবি আতাউর রহমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে গিয়ে কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বি, এ পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। টেস্টে এ্যালাউ হবার পর জানানো হলো, তাঁকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। না হলে পরীক্ষা দিতে পারবেন না। আতাউর রহমান নিরুপায় হয়ে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কাছে চিঠি লিখলেন বিপদের কথা জানিয়ে। দিন দশেকের ভেতরে একটি দীর্ঘ খাম এলো ঢাকা থেকে। খুলে দেখেন লেখা আছে According to the instruction of Dr. Md. Shahidullah Your Migration certificate is sent herewith, এবং সেই সঙ্গে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট। একজন ছাত্রের প্রতি স্নেহের দায়িত্ব, তাঁর আত্মপ্রত্যয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে তাঁর প্রভাব এসবেরই নিদর্শন এগুলো।

বেগম বাজারের বাড়িতে নীচের তলায় ছিল তাঁর লাইব্রেরী। পুরনো দালানের নীচের তলা যেমন হয়- তার ওপরের চারদিকে ছাদ অবধি উঁচু বইয়ের আলমারী। অন্ধকার, সোঁদা সোঁদা গন্ধ। আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয় দিনের বেলাতেও। একদিন সকালের দিকে গিয়ে শুনলাম তিনি লাইব্রেরীতে আছেন। লাইব্রেরীতে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু তিনি তখন জ্ঞান সাগরে নিমজ্জিত। চারপাশ তাঁর কাছে কেবল শূন্য। সামনে একজনের উপস্থিতিও।

কখনো দেখেছি তাঁর সেই ছোট্ট কামরায় নিবেদিত হয়ে কোরআন শরীফ পড়তে। ধর্মকে তিনি কেবল পালনই করতেন না, ধর্মকে অধ্যয়ন করতেন। সব ধর্ম সম্পর্কে তাঁর তুলনামূলক আলোচনায় অত্যন্ত উদার এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন প্রকাশ পেতো। ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব এক বক্তব্যে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন- "বিদ্যা ধর্মে শোভনতে। বিদ্যার মাধুর্য ও সৌন্দর্য ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে সংযোগে, বিচ্ছেদে নয়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র জীবনে এ উক্তি সার্থক হয়েছে।"...

সময়ানুবর্তিতা তাঁর জীবনের সঙ্গে ছিল অঙ্গাঙ্গী। দৈনন্দিন জীবনের সময়কে মেপে মেপে কাজ করতেন তিনি। কিন্তু এরই ফাঁকে স্নেহ মমতা স্নিগ্ধ পারিবারিক কর্তব্য এবং দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের স্ত্রী কবি হোস্‌নে আরা তাঁর ভাই ঝি। পিতৃহারা এই ভাই ঝি তাঁর সংসারেই প্রতিপালিত এবং বিয়েও দিয়েছেন তিনি। তাঁদের মেয়ের বিয়ে। বিয়ের আগের দিন হলুদের অনুষ্ঠান। দুপুরবেলা- হলুদের আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। এমন সময় ভেতরে খবর এলো শহীদুল্লাহ্ সাহেব এসেছেন। হোস্‌নে আরা তাঁকে বসিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। তিনি বললেন, কাল বিয়েতে আসতে পারবো না, তাই আজ এলাম। ব্যাগ খুলে দু'টি প্যাকেট বের করে বললেন- এটা তোমার কন্যা আর জামাইয়ের জন্যে আর এটা তোমার!

নিজের প্যাকেটখানা খুললেন হোস্‌নে আরা। একটি লাল জরী পাড় সাদা শাড়ি।

একজন প্রগতিবাদী উদারনৈতিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ডক্টর শহীদুল্লাহ্। এ প্রসঙ্গে তাঁর বহু ধরনের কর্ম কলাপের কাহিনী প্রচলিত আছে- ঢাকায় একবার মেয়েদের ঈদের

www.pathagar.com

জামায়াতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিছু কিছু সংস্কারমুক্ত পরিবারের তরফ থেকে। মহিলারা জামায়াতে সমবেত হলেন। কিন্তু কোন মৌলবী ইমামতি করতে নারাজ মেয়েদের জামায়াতে। তখন তিনি সেই জামায়াতে ইমামতি করেন। এতে করে তাঁর পারিবারিক শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা হয়েছে তাঁর স্ত্রীর নামে বেনামী চিঠি লিখে।

তাঁর চরিত্রের এমনি বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আরো কিছু আছে যেগুলো ঠিক মেলানো যায় না। তিনি একজন খেলোয়াড় ছিলেন। ভালো টেনিস খেলতেন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত প্যারিসে পড়াশুনার প্রচন্ড চাপের ভেতরেও তিনি নিয়মিত খেলতেন এবং শরীর চর্চা করতেন। শরীর চর্চার অভ্যাস রক্ষা করে এসেছেন ছোটবেলা থেকে। তাঁর নির্দেশ পেয়েছি- স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবে। স্বাস্থ্য ভাল রাখতে না পারলে জীবনে কোন কিছু করতে পারবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে আর ফ্রি হ্যান্ড কিছু কিছু একসারসাইজ করবে। লেডি ডাক্তারের কাছে যাবে, তারাই বলে দেবে নিয়ম। হৃদয়ঐশ্বর্য, প্রাণ প্রাচুর্যময় ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পান্ডিত্য, নানা বৈচিত্র-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন তাঁকে পূর্ণ মানুষ-এর সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তা সত্যিই আমাদের অভিভূত করে।

www.pathagar.com

মানবতাবাদী দার্শনিক | ডক্টর গবিন্দ চন্দ্র দেব

আসছেন তো স্যার?

হ্যাঁ মা। ইনশাআল্লাহ।

ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেবের সঙ্গে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে এ্যাতোদূর এসেছিলো যে, তিনি আমাদের বাসায় আসবেন এবং ইলিশ মাছের কোর্মা খাবেন।

পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়। যার গেট বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সি গেট। ১৯৫৩-৫৪ সাল। বাংলা ডিপার্টমেন্টের নতুন সেমিনার হল হয়েছে রেল লাইনের পাশ দিয়ে যে বিল্ডিং এল প্যাটার্ণ হয়ে ঘুরে এসে মেইন বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তারই একটি কক্ষ। দোতলা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দুই পাশে ছোট ছোট কক্ষের এক একটিতে বসেন এক এক জন বিভাগীয় প্রধান। একটিতে বসতেন মুহম্মদ আবদুল হাই- বাংলা বিভাগের প্রধান এবং তার পাশেরটিতেই বসতেন ডঃ জি সি দেব। ফিলসফি বিভাগের প্রধান।

আমরা ক'জন ছাত্র-ছাত্রী টিউটোরিয়াল ক্লাস করতে আসতাম মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কক্ষে। এসে হয়তো দেখলাম স্যার ফেরেননি ক্লাস থেকে। বেরিয়ে দীর্ঘ বারান্দার এ মাথা ওমাথা ঘুরতাম। সামনে বহুদূর খোলা। রেল লাইনের পাশ দিয়ে বস্তি। বস্তির ওপারে ছোট বড়ো দোকান পাট স্থায়ী-অস্থায়ী। কোন কোন সময় পাশেই ডঃ দেবের ঘরের দিকে নজর পড়তো। দেখি তিনিও ক্লাস থেকে আসেননি আর তাঁর টেবিলের পাশে একটি টিফিন ক্যারিয়ার।

টিফিন ক্যারিয়ারটি অবশ্যি আমাদের অচেনা নয়। কেননা, মধুদা'কে এই টিফিন ক্যারিয়ার বয়ে আনতে দেখি প্রায়ই। ওতে দেব স্যারের খাবার আসে, এটা আমাদের তার কাছেই জানা।

মাঝে মাঝে খুব কৌতুহলী হয়ে বলাবলি করতাম, খুলে দেখি তো, কি আছে ওর ভেতরে! স্যার কি খান!

একদিন সত্যি সত্যিই খুলে ফেললাম! যেই না খোলা, স্যার এসে উপস্থিত দরজার গোড়ায় একবারে আকস্মিক আবির্ভাবের মত। উদাসী মানুষ। তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলনা চোখে মুখে। হাতের বইগুলো টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, সবাই ক্ষুধার্ত। খাবার সময় হয়েছে সবার। কি বলো তোমরা...!

আমরা লজ্জায় যেন মিশে যাচ্ছি। একপাশে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে চারজন দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

ভাবছি, কি করে পালানো যায়! স্যার পানির জগ থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে বারান্দায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন প্রাণ পেলাম। সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসতেই স্যার মুখ ফিরিয়ে বললেন- এসো, সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া যাক!

আমাদের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। আবার ঢুকলাম একজন একজন ক'রে। বললেন, আনো ওটা। দেখা যাক, কি আছে ভেতরে। আমাদের ভেতরে একজন টিফিন ক্যারিয়ারটি স্যারের টেবিলের ওপরে রাখলো। খাওয়ার চাইতে স্যার কি খান সেটা দেখার কৌতূহলই বেশী আমাদের।

ঢাকনা খুললেন- দেখা গেল চার টুকরো হালকা ভাজা ইলিশ মাছ। দ্বিতীয় খোপে বিভিন্ন ধরনের সবজি সেদ্ধ। তৃতীয় খোপে বেশ খানিকটা আলুভর্তা। বরং বলা যায় চটকানো আলু, তাতে পেঁয়াজ মরিচ তেল কিছু দেওয়া হয়নি। বলা বাহুল্য, আমাদের খাবার লোভ বা স্পৃহা একেবারেই উবে গেল। আমরা প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করলাম- দুপুরে ভাত কি রুটি কিছুই খান না স্যার?

- না, ওটা খাবো রাতে। রাতে পেট ভরে ওই একবারই ভাত খাই। তাতে ঘুম ভাল হয়। দিনে খেলে কাজ করা যায় না।

- সকাল বেলা কি নাশতা করেন?

- শুধু এক পোয়া ছানা। চিনি ছাড়া।

- কেন? চিনি ছাড়া কেন?

- চিনি রাখা ঝামেলা। পিঁপড়ে টিপড়ে ধরে!

স্যার চিরকুমার। তাঁর বাড়িতে দু'চারবার গিয়েছি পড়াশুনার ব্যাপারে। বাড়িতে ছিলেন সম্ভবত তাঁর পালক পুত্রবধূ। তিনিই দেখাশোনা করতেন তাঁকে।

একদিন গিয়েছি, বেলা এগারোটা নাগাদ। দেখি বারান্দার ধারে একটি টুলে বসে আম খাচ্ছেন। আমি যেতেই ছেলের বউকে ইশারা করলেন আমাকে বসতে দেবার এবং আম খেতে দেবার।

খাওয়া শেষ হলে উনি উঠে এসে বসলেন চেয়ারে। কিন্তু কোন কথা বলছেন না। আমি একটু আশ্চর্য হলাম। খুব বিব্রত বোধ হতে লাগলো এই ভেবে যে, বাড়িতে এভাবে পড়তে আসার জন্যে উনি কি বিরক্ত হয়েছেন! কিন্তু তিনি নিজেই তো সময় দিয়ে বলেছিলেন, অমুক সময়ে বাসায় আসতে পারলে এসো। আমি পড়িয়ে দেব।

আমি বারান্দায় বের হয়ে এগোতেই দেখি তাঁর পুত্রবধূ। তিনি আমাকে ওভাবে বেরিয়ে আসতে দেখে বললেন- কথা বলছেন না তো! আজ যে ওঁর মৌনব্রত! আসলে ভোলা মন তো! তাই আপনাকে আসতে বলেছেন! উনি তো এখন কথা বলবেন না!

ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেবের প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট ঘটনা এগুলো। কিন্তু ধীরে ধীরে অনুধাবন করেছি, বাইরে থেকে তাঁকে বোঝার উপায় নেই, তিনি কত বড় মানুষ- কত বড় একজন দার্শনিক ব্যক্তিত্ব! অন্যতম দর্শন শাস্ত্রবিদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। তিনি ডঃ দেবের গুণগ্রাহী সুহৃদ। তাঁর মুখে শুনেছি, ডঃ

www.pathagar.com

দেব ছিলেন অত্যন্ত প্রচার বিমুখ। নিজের সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করা হলে, কিছু জানতে চাইলে, তিনি দু'চার কথায় তার জবাব দিয়ে শেষ করে দিতেন প্রসঙ্গ। তাঁর মৃত্যুর পর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর গ্রামের বাড়ির প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

ডক্টর জি, সি, দেব এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এ-দু'জন উপমহাদেশে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের দার্শনিক প্রতিনিধি। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা দর্শন শাস্ত্রের বহু সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করতে গেছেন একসঙ্গে।

১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার তৎকালীন পঞ্চখন্ডকালা পরগণার লউতা গ্রামে ডঃ দেবের জন্ম। তাঁর বাবা ঈশ্বরচন্দ্র পুরকায়স্থ। তিনি এবং তাঁর পূর্ব পুরুষেরা জমি-জমা জরিপ কাজের ব্যাপারে প্রধান বা 'পুরকায়স্থ' ছিলেন। পঞ্চখন্ডকালা পরগণায় তাঁর পূর্ব পুরুষদের ছোট খাটো একটি জমিদারীও ছিল। পরে অবশ্যি সেটা রক্ষা করা যায়নি। অর্থনৈতিক কারণে তা বেহাত হয়ে যায়।

গোবিন্দ চন্দ্র লেখাপড়া শুরু করেন তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি বিয়ানীবাজার হাই স্কুলে। ১৯২৫ সালে সংস্কৃত ও অংকে লেটারসহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা বা এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর বড় ভাই বিনোদ চন্দ্র দেবের অভিভাবকত্বে তিনি কলকাতায় রিপন কলেজে (বর্তমানে স্যার সুরেন্দ্র নাথ কলেজ) ভর্তি হন। বড় ভাই তখন কলকাতাতেই একটি জীবন বীমা অফিসে চাকরি করতেন। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাই। গোবিন্দ চন্দ্র ছিলেন চতুর্থ।

১৯২৭ সালে দেব তর্কশাস্ত্রে লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে আই এ পাস করেন। ছোট বেলা থেকেই হয়তো ধর্মপ্রাণরূপে গড়ে উঠেছিলেন। কলকাতা যাবার পর রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াত শুরু হয় তাঁর এবং গঙ্গার ওপারে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হয়ে যান। এতে করে অবশ্যি তাঁর লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটেনি। নিয়মিতভাবেই সংস্কৃত কলেজের দর্শন বিভাগে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা বিশ্ব বিশ্রুত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ছিলেন সে কলেজের অধ্যক্ষ। অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন দেব। এই কলেজ থেকেই প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাস করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পাস করে তাঁর প্রথম বিদ্যাপীঠ সুরেন্দ্রনাথ কলেজেই চাকুরী জীবন শুরু।

দর্শন শাস্ত্রের ওপরে মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন ডঃ দেব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ১৯৫৩ সালে এবং তারপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার একনিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন ডঃ দেব। তিনি আসার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের গবেষণায় সঠিক পথ প্রদর্শন এবং অনুপ্রেরণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। তিনি আসার পর তাঁর উৎসাহে ছাত্র এবং সহকর্মীদের অনেকেই অনুপ্রাণিত হন এবং কাজ শুরু করেন।

দেব শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উত্তর সাধক ছিলেন এবং একই সঙ্গে বুদ্ধদেবের

www.pathagar.com

প্রতি ছিল তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা। বুদ্ধদেবের মানবপ্রেম এবং দরিদ্রসেবা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে বুদ্ধদেব ছিলেন নির্বাক। তা সত্ত্বেও ধর্মপ্রাণ দেব তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিলো এক সার্বজনীন নৈতিক আদর্শের- যার ভেতরে ধর্ম আছে, আছে মানবিকতা এবং পৃথিবীর ভোগবিলাস বিরোধী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং বুদ্ধদেবের জীবনে যে মৌলিক ঐক্য খুঁজে পেয়েছিলেন তা হলো মানবিকতা। তিনি বলেছেন, 'ধর্মের ভেতরেই রয়েছে মানবতা বোধের প্রেরণা।'

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন- "...দেবের জীবনে দার্শনিক মনীষার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা এদেশের দর্শনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবদান বলে অবশ্যই স্বীকৃত হবে। তবে দার্শনিক দেবের চেয়ে মানবতাবাদী দেবের স্থান অনেক উচ্চে। তিনি এদেশে মানবতাবাদের এক প্রতিনিধি হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতার জীবন যখন বিপদাপন্ন তিনি তখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষক। কলেজটিকে নিরাপদ রাখার জন্যে কর্তৃপক্ষ একে কলকাতা থেকে দিনাজপুরে স্থানান্তর করেন। দেবও চলে আসেন দিনাজপুরে। এই সময়ে এই কলেজে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান ছাত্রকে ভর্তি হবার সুযোগ করে দিয়ে তিনি ছাত্র এবং অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। এখানে গোবিন্দ চন্দ্র দেব হিন্দু মুসলমান সব মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তাঁর আচরণে একজন মানুষ এবং শিক্ষক হিসাবে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কলেজটিকে আবার কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু দেব আর ফিরে গেলেন না। দিনাজপুরেই সেই স্বল্পকাল স্থায়ী কলেজকে তিনি একটি স্থায়ী কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলেন, স্থানীয় ছাত্রদের সুবিধার জন্যে। কলেজটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে অধ্যক্ষ রূপে পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। এতে করে তাঁকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে, তা সত্ত্বেও।

ডঃ দেব ছিলেন চিরকুমার। সংসার-ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা ঘটেনি তাঁর জীবনে। প্রেম, ভালবাসা, মমতাঘেরা সাংসারিক পরিবেশ তিনি পাননি। অথচ তাঁর ভেতরে অদ্ভুত এক মমতার নির্ঝরণী বইতো, এটা যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা জানেন। দুর্বল মুহূর্তে শিশুর মত জানাতেন তিনি কি কি খেতে ভালবাসেন। ইলিশ মাছ ছিলো তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ইলিশ মাছের কোর্মার মাঝে মাঝে বায়নাও দিয়েছেন তিনি। বলতেন আমি যাবো তোমার বাসায়...

তাঁকে দেখে মনে হতো- ঘর ছাড়া মমতার আশ্রয়হীন একটি মানুষ। তিনি যখন পথ চলতেন, মনে হতো ভিন্ন কোন এক জগতে বিচরণ করছেন। দীর্ঘদেহী। পোশাক পরিচ্ছদ এলোমেলো। ধোপার বাড়ির ধোপ দুরস্ত কাপড় চোপড় খুব কমই পরতে দেখা গেছে। ধুতি পাঞ্জাবী পাম্পসুই ছিল তাঁর সাধারণ পরিধেয়। শীতের দিনে একটি কোট তার ওপরে সাদা খদ্দরের চাদর। মাথার চুলে কখনো চিরুণী পড়তো কিনা সন্দেহ। পায়ের জুতো কেনার পর পুরনো হয়ে ফেলে দেওয়া পর্যন্ত কালির স্পর্শ পেতো না সম্ভবত।

কখনো মনে হতো গুরু গম্ভীর, কখনো হাস্যোজ্জ্বল। আত্মভোলা। অত্যন্ত সাদামাটা

www.pathagar.com

জীবন যাত্রার অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সারা জীবনের উপার্জিত সঞ্চিত অর্থ এবং একখানা বাড়ি তিনি উইল করে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগকে। উইল অনুসারে ১৯৮০ সালে বিশ্ব বিদ্যালয়ে Dev Center For Research গঠন করা হয়েছে। উইলের নির্দেশ অনুযায়ী একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। এর কর্মকর্তাগণ দর্শনের নানা বিষয়ের ওপরে বক্তৃতা এবং আলোচনার আয়োজন করে আসছেন। দেশ-বিদেশের অনেক দার্শনিক মনীষী এতে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

এদেশের দর্শনচর্চার প্রাণকেন্দ্র মানবতাবাদী এই ব্যক্তিত্ব জীবনের অবসান ঘটে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের রাতে। পাকিস্তানী হানাদারদের হত্যাকান্ডের প্রথম শিকার হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের একজন তিনি। হানাদাররা যখন আক্রমণ করে, তখন তিনি তাঁদের সামনে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে Goodes Sense Good Sense বলে তাদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মত সার্বজনীন প্রেমিক মানুষ একথা ভাবতে পারেননি যে, তার এই মহান আবেদন সম্পূর্ণ অপাত্রে দান। তাদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে একাধিক গুলি তাঁর বক্ষ ভেদ করে দেহকে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করেছিলো। তিনি ঢলে পড়েছিলেন মৃত্যুর কোলে। শুনেছি- বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের ইমাম, তাঁর জীবনের এই পরিণতির কথা জেনে অশ্রুপাত করে বলেছিলেন- একজন ভালো মুসলমানের চরিত্রের সবরকমের গুণ ছিল তাঁর।

শেষ দেখা হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে আমার নজরুল একাডেমীতে একটি মিলাদ মাহফিলে- ফাতেহা দোয়াজ দাহম উপলক্ষে। নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তালিম হোসেনের আমন্ত্রণে এর আগেও তিনি দু'একবার এসেছেন একাডেমীতে। তিনি এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন প্রধান বক্তা। কোরআন শরীফের বিশেষ বিশেষ আয়াত তার অর্থ, রসুল করিম (সঃ)-এর অনেক হাদিস তিনি বর্ণনা করলেন। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলাম। অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রণ জানালাম আমাদের বাসায়। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন, তাঁর খাওয়ার মেনু কিছু বদলে গেছে। সেই মেনু জানালেন। এবং সময় নির্দেশ করে বললেন- আসবো মা, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু সে আসা আর হয়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

তিনি এখন স্মৃতি | আবুল কালাম শামসুদ্দীন

তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে বাসায় গিয়েছিলাম দেখতে। কিন্তু রোগশয্যায় তাঁকে দেখে সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। মনে হলো যেন একটি মহীরুহ ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে। তাঁর এ রূপ এর আগে দেখিনি- ভাবিওনি। তাঁর হাসি মুখে ঋজু দেহে প্রাণময়তা দেখেছি শুধু। কিন্তু তখন মনে হয়নি যে এই ঝড় শিকড়ও নাড়িয়ে দিয়েছে।

তাঁকে যারা দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই বলছিলেন- এই সেদিনই তো তাঁর সঙ্গে বসে চা খেয়ে গল্প করে এলাম। ..... কেউ বললেন, সেদিনই তো দেখা হলো, আউটার স্টেডিয়ামে খেলা দেখে ছড়ি হাতে ফিরছিলেন। পথের ওপরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলাম কতক্ষণ। .... কেউ বললেন, একই সঙ্গে বাজার করলাম আমরা, ক'দিন আগেই।....

বাসা থেকে হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়েছিলো সুচিকিৎসার জন্যে। তাঁর অবস্থার কিছুটা উন্নতিও দেখা দিচ্ছিল। আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েরা তাঁকে খুশী মনে কথাটি জানালে তিনি বলেছিলেন, আমি ভাল হইনি। তোমরা বুঝতে পারছো না। নেভার আগে প্রদীপ একবার জ্বলে ওঠে...

সত্যিই প্রদীপ নিভে গেল। কিন্তু উনি কি আসলেই জানতে পেরেছিলেন সেকথা? অনেকে বলেন খুব 'সাচ্চা দিলে'র মানুষ হলে তাঁরা নাকি বুঝতে পারেন।

দেখতে দেখতে সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন তিনি।

স্কুল জীবনে প্রথম আমি তাঁর নাম শুনেছিলাম। 'আজাদ' পত্রিকার মওলানা আকরম খাঁ তখন নানা কারণে আমাদের চারপাশে আলোচনার বিষয় ছিল। সেই 'আজাদ' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

ঢাকায় যেদিন তাঁকে প্রথম দেখি সেদিন আমার মনে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল ছিল। পরবর্তী কালে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পেরে অত্যন্ত গৌরব বোধ করেছি।

দীর্ঘদিন তাঁর স্নেহের ছায়ায় কাজ করে এসেছি। 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ (পরে দৈনিক বাংলা) ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি এর সম্পাদক পদে ছিলেন। তাঁর সহজ সুন্দর প্রশান্ত সঙ্গ লাভ করে এসেছি আগাগোড়া। যখন আমার হাতে কাজ থাকতো না অথবা হাতের কাজ শেষ করে প্রায়ই খোঁজ নিতাম, তাঁর ঘরে কেউ আছেন কি না। তিনি একা আছেন কি না।

www.pathagar.com

কেউ নেই- তিনি একা আছেন, জেনে তাঁর কামরার দুয়ারের নব ঘুরিয়ে ঢুকতাম। শব্দ পেয়ে মুখ তুলতেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঝলমলে হাসিমুখে বলতেন আসেন আসেন। সামনের চেয়ার দেখিয়ে বলতেন- বসেন। বসার পর জিজ্ঞেস করতেন- সবাই ভালো তো! তালিম হোসেন সাহেব! তারপর অনেক কথা। অনেক গল্প। কিছু জিজ্ঞাসা না করেই চা আনাতেন। সঙ্গে নাশতা- কখনো বিস্কুট, কখনো সিংগারা, কখনো পেস্ট্রি। প্রথমেই পিরিচটা আমার দিকে এগিয়ে ধরতেন। আমি বিব্রতভাবে বলে উঠতাম- আপনি আগে নেন!...

তিনি আরো এগিয়ে দিয়ে আরো জোর দিয়ে বলতেন- নিচ্ছি, আপনি নেন!

পান টেবিলেই থাকতো, না থাকলে আনাতেন। আমি পান খাই না, তা তিনি ভাল করেই জানেন। তবু আমার মুখের দিকে চেয়ে বলতেন- খাবেন একটু! আমি কখনো খেতাম। কখনো বলতাম- জী না, একটু সুপারিই খাই!

উনি হাসতে হাসতে বলতেন- পান খাওয়া প্রায় উঠেই যাচ্ছে। আমরা অনেক কম বয়সে পান ধরেছি। আজকাল পান তেমন খায় কই... পানের অভ্যাস ভাল না। না খাওয়াই ভাল।... বলতে বলতে পানের প্রতিই একটু যেন বিরূপ ভাব ফুটিয়ে তুলতেন নিজের চোখে মুখে।

অথচ আমরা জানি পান আর সিগারেট তাঁর কত প্রিয়, তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। তাঁর টেবিলে চা, পান, সিগারেট- আপ্যায়নের কাহিনী তাঁর জীবন কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

গল্প করতেন নানারকম। সাধারণতঃ পুরনো দিনের গল্প। নজরুল ইসলাম বা শেরে বাংলার কথা, মোহামেডান স্পোর্টিং বা মওলানা ভাসানীর কথা। তাছাড়া সাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, কখনো তাঁর চাকরি জীবনের ইতিহাস। সে গল্প গুলো বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, কতকগুলো কাহিনী অভিনয়ের মত করে শোনাতেন। আবার অনেক কাহিনী বলতে বলতে শিশুর মত হেসে উঠতেন। যেন ঘটনাটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন- তাই এমনিভাবে উপভোগ করছেন। প্রায়ই কথা প্রসঙ্গে তাঁর মুখে এমন সব লোকের অকুণ্ঠ প্রসংসা শুনতাম, যাঁদের অনেকের সঙ্গেই তার মতের, আদর্শের কোন মিল নেই। তাঁদের কেউ রাজনীতিক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ সাংবাদিক।

অফিসে একটি জিনিস প্রায়ই ঘটতো। তাঁর পাশের কামরাতেই আমি আর কবি আহসান হাবীব বসি তখন। আমাদের কামরাই আগে। মাঝে মাঝে দু'চারজন বাইরের লোক হঠাৎ এসে আমাদেরই দরজায় উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব কি আছেন?

আমরা মুখ তুলে তাকাতেই বলতেন- উনি কোথায় বসেন?

তখন হয়তো তাঁর ব্যস্ততার সময় অথবা হয়তো তখন লাঞ্চ আওয়ার। আমাদের 'এডিটর' সাহেব হয়তো তখন খাবেন অথবা বিশ্রাম নেবেন। সুতরাং সরাসরি তাঁর ঘর

www.pathagar.com

না দেখিয়ে প্রশ্ন করতাম কি প্রয়োজন তাঁর কাছে?

- তাঁকে একটু দেখবো! দেখতে এসেছি তাঁকে।

শুধু একদিন কি দু'দিন নয়। অনেকদিন হয়েছে এরকম। অনেক দূর জেলা মফস্বল গ্রাম থেকে রাজধানী শহরে এসেছেন কোন কাজে তাঁরা। সেই সুযোগে প্রবীণ সাংবাদিক এবং প্রাচীন 'আজাদ' সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবকেও দেখে যাবেন। দেখে তাঁদের কৌতূহল এবং সাধ পুরা করবেন।

দেশের জনমানুষের হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল তাঁর অবস্থান। সত্যিকার ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিকের ভূমিকা পালনই ছিল হয়তো এর মূল কারণ। আবুল কালাম শামসুদ্দীন একটি লিজেন্ডারী ফিগার। এখন অনেকেই সেটা অনুভব করছেন। ধীরে ধীরে তা আরো গভীরভাবে অনুভব করবো আমরা। বিটিশ ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ- প্রায় পৌনে এক শতাব্দীকাল কত ভাঙা গড়ার ভেতর দিয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন। কত রাজনীতি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ভাঙা গড়া উত্থান পতনের সাক্ষী তিনি। কত শিল্পী-সাহিত্যিকের জন্ম লগ্নে তাঁদের ধাত্রীর ভূমিকায় ছিলেন। কত কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। এসব ক্ষেত্রে পাকা জহুরীর মত মণি কাঞ্চন বাছাই করেছেন! কাজী নজরুল ইসলামকে তিনিই প্রথম 'যুগস্রষ্টা' কবি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক ভূমোদর্শনের রায় এটা।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যও সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর শিশু সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি আজো বিশিষ্ট সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আমাদের আজকের আধুনিক সাহিত্যিক এবং পাঠকরা সে খোঁজ রাখেন কি না জানি না। বাংলা একাডেমী যদি সেসব সংকলিত করে পুনঃপ্রকাশের ভার নেয়, তবে সে সব সত্য আবার নতুন করে উদঘাটিত হতে পারবে।

অনেক জটিলতা, অনেক ঝড় ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন। সে জীবন একটি ইতিহাস। হয়তো জাতির, দেশের সমগ্র ইতিহাসের বেশ কয়েক অধ্যায় জুড়ে তা থাকবে। সেখান থেকে অনেক কিছু জানার আছে- গ্রহণ করার আছে।

কিন্তু এত অবদান, এত হৃদয় ঐশ্বর্য যাঁর, তাঁকে দেখলে তা মনে হয়নি কখনো। নিজেকে জাহির করার কোন লক্ষণই দেখা যায়নি তাঁর কোন কথায়, কোন আচরণে। সর্বদা স্মিত হাসিমুখ। দু'চোখে অদ্ভুত এক সরলতা। চোখে মুখে এমন এক সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফুটে থাকতো, যেন কতকিছু তাঁর জানার আছে সবার কাছ থেকে। সবাই সব জানেন, কেবল তিনি ছাড়া।

কিন্তু তাঁর অন্তরে একটি উজ্জ্বল শিখা জ্বলতো সব সময়। সে শিখায় উৎকীর্ণ ছিল সত্য এবং ন্যায়ের শপথ। তাঁর সাংবাদিক জীবনে এর অনেক স্বাক্ষর রয়েছে। পত্রিকা অফিসে দেখেছি মাঝে মাঝে, কোন বিষয় তাঁর মনঃপূত না হলে তিনি তাঁর মতে অনড় থেকেছেন। এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে, কোন মিটিংয়ে অথবা আলোচনায়

www.pathagar.com

এরকম কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তিনি টেবিলের ওপরে তাঁর দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাত ঠুকছেন প্রতিবাদ করে।।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং অবদান এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি তখন 'দৈনিক আজাদ' এর সম্পাদক। এই সময়ে তিনি প্রাদেশিক আইন সভারও সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে যখন ছাত্র-জনতার ওপরে গুলি বর্ষিত হয়, তখন আইন পরিষদ সভার বৈঠক চলছিল। গুলি বর্ষণের খবর পেয়েই তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে আইন সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন। পরিষদ-গৃহ থেকে বেরিয়ে সোজা 'আজাদ' অফিসে চলে আসেন এবং একটি প্রতিবাদী সম্পাদকীয় লেখেন।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র-জনতা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে একটি সভার আয়োজন করে এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবকে তারা নিয়ে আসে এতে সভাপতিত্ব করার জন্যে। সেখানেই আজকের শহীদ মিনারের উদ্বোধন হয় তাঁরই হাতে।

মৃত্যুর ক'দিন আগের কথা। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে-১২৮ নম্বর কেবিনে। ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটি সারাদিন উৎসব-অনুষ্ঠান মুখর। পিজি হাসপাতাল থেকে খুব বেশী দূর নয় বাংলা একাডেমী। সাতদিনব্যাপী ভাষা আন্দোলনের অনুষ্ঠান চলছে সেখানে। সারা শহর সরগরম। বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানমালায় আমরাও গিয়েছি দল বেঁধে। একুশে ফেব্রুয়ারীর বিকেলবেলা হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ারে তাঁকে দেখতে গেলাম- আমি এবং তালিম হোসেন। আরো অনেকবার গিয়েছি তাঁকে দেখতে। কিন্তু সেদিন আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম এক গুচ্ছ ফুল।

সেদিন তিনি কিছুটা ভাল। তখন কেবিনে ছিলেন তার স্ত্রী এবং জামাতা মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। আমার হাতের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন তিনি- ওটা কি? বললাম আপনার জন্যে ফুল। আজ একুশে ফেব্রুয়ারী। তালিম হোসেন বললেন, একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের আপনি তো একজন হীরো। একজন প্রধান ব্যক্তি এই আন্দোলনের।

স্মিতহাসি দেখা দিল তাঁর ঠোঁটের কোণে। অস্পষ্টভাবে যেন আধা সম্বিতের ভেতর থেকে বললেন- অ।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাসায় গিয়েছিলাম। সামনের ঘরেই খাটের ওপরে শায়িত তাঁর দেহ। কিছু আগেই হাসপাতাল থেকে আনা হয়েছে। আপাগোড়া সাদা কাপড়ে মোড়ানো। লোবান জ্বলছে। তার সুগন্ধি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ছোট ঘরটি। বারান্দায় কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে। ঘরে মুর্দার পাশে তখন অন্য কেউ নেই। শুধু গালে হাত দিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন। দৈনিক বাংলার পিয়ন বখতিয়ার। এককালে সেই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত পিয়ন। চা-নাশতা-পান সিগারেট আনা নেওয়া এবং কাগজপত্র ফাইল

www.pathagar.com

টানাটানির ব্যাপারে সে ছিল সর্বক্ষণ তার প্রিয় এডিটর সাহেব-এর পার্শ্বচর। কাজ না থাকলেও তাঁর পাশেই ঘুর ঘুর করতো।

আমি ঘরে ঢুকতেই বেদনাহত দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। তারপর মুর্দার পাশে গিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর মুখের কাপড় খুলে দেখালো আমাকে। দেখা হলে আবার খুব সন্তর্পনে মুখ ঢেকে রাখলো।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতেই- লক্ষ্য করলাম আরো কেউ কেউ তাঁকে দেখার জন্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে। এবং বখতিয়ার সেই একই ভাবে তাঁর মুখ খুলে দেখিয়ে আবার ঢেকে রাখছে।

বখতিয়ারের আসল নাম নারায়ণ। ৭১ সালে যুদ্ধের সময় হানাদারদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে আমরা তাকে এই মুসলিম নামে ডাকতাম। পরে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এখনো সে কারো কাছে নারায়ণ কারো কাছে বখতিয়ার।

দৃশ্যটি দেখে এই মর্মন্তুদ শোকের পরিবেশেও বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। 'এডিটর সাহেব' তার কত আপন। 'এডিটর সাহেব' তাকে কতটা আপন ভাবতে দিয়েছিলেন।

বখতিয়ারকে ওইভাবে দেখে আমাদের সবার সঙ্গে তাঁকে ঘিরে তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান' এবং 'দৈনিক বাংলার' ছোট বড় অনেক আনন্দ বেদনার ঘটনা, কাহিনী নতুন করে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো ওর সামনেই।

প্রায় বিরাশি বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন। মনে পড়লো তাঁর আয়ুষ্কালের আশি বছর পুর্তির কথা। সে সময়, বোধ হয় সেই প্রথম তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একটি ছবি এবং সেই সঙ্গে কিছু সংবাদ একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।

তাঁর মৃত্যুদিনে- সেই রাতে রেডিও-টেলিভিশনে তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে শোক অনুষ্ঠান প্রচারিত হলো। সেই সঙ্গে তাঁর সেই টেলিভিশন সাক্ষাৎকারটিও এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পুনঃপ্রচারিত হয়। হঠাৎ সেই স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসি মুখখানা পর্দায় ভেসে উঠলো- কথা শোনা গেল। সেই অবিস্মরণীয় মন্তব্য- 'যত কিছুই হোক, সাংবাদিকদের ভেতরে যদি প্রকৃত সততা এবং নিষ্ঠা থাকে, তবে কোন কিছুই তাদের কর্তব্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।.....

কথাটা আমার কাছে যেন তাঁর শেষ বাণী হয়ে এলো। সম্ভবত সকল সৎ সাংবাদিকদের কাছেই।

www.pathagar.com

একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব | মাহবুব-উল আলম

তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান এর সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কামরায় বসে আলাপ করছিলাম তাঁর সঙ্গে, এমন সময় দরজার নব ঘুরিয়ে একজন ঢুকলেন। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বললেন- আসতে পারি?

দীর্ঘ দেহ- উচ্চতা মাথার ওপরে চৌকাঠ ছুঁই ছুঁই। একহারা, মাথায় কিস্তি টুপির বাইরে সাদা চুলের ঘের। পরণে পাজামা শেরোয়ানী। হাতে একটি ব্যাগ।

শামসুদ্দীন সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাস্যবিগলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন- আসুন, আসুন!

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি ইতিমধ্যে, ঘুরে দরজার দিকে মুখ করে। আগন্তুক এগিয়ে এলেন। তাঁরা দুজন বসলে আমিও বসলাম। শামসুদ্দীন সাহেব বললেন আমাকে- চেনন না! মাহবুব-উল-আলম 'পল্টন জীবনের স্মৃতি, মোমেনের জবানবন্দী- পড়েননি!

জনাব মাহবুব-উল-আলম বললেন, উনারে তো চিনলাম না!

- উনি আমাদের মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা। নামও বললেন। বলরেন, প্রতি সপ্তাহে উনার লেখা বের হয় 'মিতশ্রী' নামে, 'সদর অন্দর' লেখেন!

মাহবুব-উল আলমের চোখে মুখে যেন কৌতুকের হাসি খেলে গেল। - ও আচ্ছা। উনাকে চিনি নাই 'মিতশ্রী'কে জানি। অবশ্য নামে! যাক, দেখলাম!

শামসুদ্দীন সাহেব বললেন তা ছাড়া উনি বেগম তালিম হোসেনও!

শুনে আবার নতুন করে খুশী হলেন যেন। অনেক কথা বললেন। বেশ ধীরে ধীরে কথা বলেন তিনি। কথার ভেতরে কোন হৈ চৈ নেই। ধীরকণ্ঠে অনেক ঠাট্টা, অনেক রসিকতা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কর্তা ভালো আছেন তো! তাঁকে আমার সালাম বলবেন।

সেই প্রথম দেখলাম সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং যোদ্ধা মাহবুব-উল আলমকে। তাঁকে ভালো করে দেখতে লাগলাম- এত ধীর-স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষটি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন এবং ইরাকের কুত-আল-আমারার যুদ্ধ ফ্রন্টে যান। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন তাঁর 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' এবং এর পরই প্রকাশিত হয় তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'মোমেনের জবানবন্দী'।

আমাদের এডিটর আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। আমাকেও অংশী করলেন তাঁদের আলাপ আলোচনার। কত নতুন, পুরনো জীবনের কথা, সমাজের কত ঘনিষ্ঠ বিষয়, কত শিল্প-সাহিত্যিকের ইতিবৃত্ত। অনেক বিষয় নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন, দুঃখ করলেন অনেক কিছু নিয়ে। অল্প ক্ষণের মধ্যে খুব আন্তরিক হয়ে উঠলো পরিবেশটি।

www.pathagar.com

এর অনেকদিন পর আবুল কালাম শামসুদ্দীন তখন আর জীবিত নেই। দৈনিক বাংলা অফিসে এসেছিলেন তিনি। কবি আহসান হাবীব এবং আমি এক কামরায় বসি। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন আহসান হাবীব সাহেবের কথা। বললেন, উনি আসেননি? - জিনা, আসেননি, তবে আসবেন হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই-

বসি তাহলে! অপেক্ষা করি! আপনার সঙ্গে কথা বলি।

বয়সের ভারে কিছুটা ভারাক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন- একটু কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম, আসলাম যখন, তখন সবার সঙ্গে দেখা করে যাই।

বসতে বসতে বললেন- আমাকে চিনতে পেরেছেন তো!

কথাটার বিনয় অস্বাভাবিক বোধ হলো আমার কাছে। তাঁকে আমি চিনতে পারলাম কি না এ প্রশ্ন কি তাঁর দিক থেকে আশা করতে পারি! তিনি আরো বললেন- আপনার লেখা আমি পড়ি। ভাল। লিখুন। আমি যথাযথ ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে এর জন্যে।

বললেন, তালিম হোসেন সাহেব কেমন আছেন? অনেক দিন দেখিনা। যখন মাহে-নও, পুর্বাচলে ছিলেন উনি- দেখা সাক্ষাৎ হতো। অনেকক্ষণ বসে আরো অনেক গল্প করলেন। বারবার শামসুদ্দীন সাহেবের কথা বললেন। তাঁর অনেক পরিচিত মানুষের কথা বললেন। সময়ের পরিবর্তনের কথা তুললেন। মেয়েদের সাহিত্য-সাংবাদিকতা নিয়েও মন্তব্য করলেন। আমার মতামত জানতে চাইলেন। অনেক খবর জানার অদ্ভুত এক কৌতূহল প্রকাশ পেল তাঁর কথাবার্তায়। খুব অল্প সময়ের ভেতরে এই প্রবীণ প্রতিথযশা সাহিত্যিক-সাংবাদিক নিজের উঁচু স্তরটি থেকে আমার স্তরে নেমে এলেন যেন। তাঁর এই সারল্য আমাকে অনেক কথা মনে করিয়ে দিলো। মনে হলো এর নাম হৃদয় ঐশ্বর্য। যে ঐশ্বর্যের আজকাল খুব অভাব।

প্রসঙ্গক্রমে গতায়ু আরো এক জন সাহিত্যিক, সমাজ সেবক এবং চাকরি জীবনের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিত্বের কথা এসে যায়। খুব সামান্য সময়ের ব্যবধানে তাঁরা দুজনই একটি শূন্যতার সৃষ্টি করে চলে গেলেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী। যে কোন বৈঠকে সুযোগ পেলেই সবার সঙ্গে আলাপে মেতে উঠতেন। এক মুখে কত কথা বলতেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিলো। দেখলাম, শরীর অনেক ভেঙে গেছে। শরীর ভেঙে গেছে কিন্তু মুখের হাসিটি ম্লান হয়নি। সারামুখে তেমনি প্রসন্ন ভাব। কেমন আছেন- ভালো আছি... এমনি দু'চার কথার পরই বললেন, আপনার কোন বই কিন্তু আমাকে দেননি!... আমি এখনো পড়াশুনা করি।...

লজ্জা প্রকাশ করলাম। দুঃখিত হলাম।

এমনি প্রবীণ এবং খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও অনেক খবরই রাখতেন তাঁরা সহ মর্মী, সহধর্মী ছোট- বড় অনেকের সম্পর্কে। সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে এই ধরনের আগ্রহ এই ঘনিষ্ঠতাবোধ অনেক মূল্যবান বস্তু সংস্কৃতি অঙ্গনে।

www.pathagar.com

আনন্দ এবং বেদনা ছিল সঙ্গী | মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখার জানার সুযোগ হয়েছিলো আমার। অত্যন্ত প্রাণবন্ত একটি হৃদয় অত্যন্ত সজীব একটি মনের অধিকারী।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার সঙ্গে পরিচয় হলো তাঁর জীবনের অপরাহ্ন বেলায়। বয়সের এবং স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে তাই মনে হলেও তাঁর মন ছিল অনেক তরুণীর চেয়েও উজ্জ্বল-উচ্ছল। মনের ওপরে বয়স দাঁত বসাতে পারেনি। তাঁর কেমন আছো- প্রশ্নের জবাবে নিজেদের অনেক সমস্যা, অসুখ বিসুখ সম্পর্কে বলেছি। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে এ ধরনের কোন কথা শুনেছি বলে মনে হয়না। অন্তত নিজে তিনি এসব নিয়ে শুরু করেননি কোন কথা কোন আলাপ। আন্তরিকতা সহানুভূতি নিয়ে শুনেছেন আমাদের সমস্যার কথা- উপদেশ, পরামর্শ, সান্ত্বনা দিয়েছেন।

দীর্ঘদিন, প্রায় তেরো-চৌদ্দ বছর হার্টের জটিল রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু আমরা, যারা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে এসেছি, তাঁর মুখ দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, তিনি কঠিন কোন রোগে ভুগছেন!

জীবনের শেষ দিনগুলোয় তিনি ছিলেন ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনের এক ফ্ল্যাট বাড়িতে। হৃদরোগের রোগী সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামা বারণ। তাই প্রায়ই তিনতলার জানালার ফ্রেমে তাঁর মুখখানা দেখা যেত। অপলক চোখে চেয়ে থাকতেন প্রকৃতির দিকে। মনে হতো সমস্ত জগ এসে যেন সেই জানালা পথে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করছে। আর সেখান থেকে পরিচিত মুখ দেখলেই ডাকতেন 'এসো' 'এসো' সুরে।

খুব খুশী হতেন কেউ গেলে। অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলতেন, জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাতেন। একটি অত্যন্ত স্নেহময়ী হৃদয় ছিল তাঁর। তাই হৃদয়ের সেই ঐশ্বর্য দিয়ে সবাইকে ধরে রাখতে চাইতেন। তাঁর পাশের বাড়িতে অনেক দিন ছিলাম আমি। দেখা শোনায় দীর্ঘ ছেদ পড়লেই ছোট্ট একটি চিঠি এসে উপস্থিত হতো। তাঁর কাজের ছেলেটি সকাল দুপুর সন্ধ্যার যে কোন সময়ে এসে হাজির হতো সেটা নিয়ে। তিনি লিখেছেন হয়তো-

'সুচরিতাসু, কেমন আছো? খুব ব্যস্ত বুঝি চাকরী আর সংসার নিয়ে। অনেকদিন দেখিনা। আমাকে ওরা নামতে দেয় না। না হলে আমিই যেতাম। ডাক্তারের বারণ তেতলা থেকে নামা ওঠা। সময় করে একবার এলে খুশী হব। ছেলেমেয়েদের আমার দোয়া। তোমরা দু'জন আমার স্নেহ ও শুভেচ্ছা নাও।

খালা

www.pathagar.com

কিন্তু আমি তাঁকে তেমনি করে খুশী করতে পারিনি। কারণ যেতে পারিনি সব সময়। মাঝে মাঝে যেতাম। গেলেই , আর কে কে এসেছিলো তাঁর কাছে, কে কি বললো, কে কেমন লিখছে- এছাড়া তাঁর পুরনো দিনের কথা... এমনি কত কি।

এরই ফাঁকে ফাঁকে অনেকের খোঁজ নিতেন আমার কাছ থেকেও। কতজনের খবর জানতে চাইতেন। উঠে আসতে চাইলেই নারাজ। বলতেন, আরো একটু বসো। এইতো এলে! আবার কবে আসবে!

খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। এর ফলে কোথায় কি ঘটছে তার অনেক খবর রাখতেন। বিভিন্ন মঞ্চেও অনুষ্ঠানগুলো জানা থাকতো তাঁর। মাঝে মাঝে লিখে পাঠাতেন... তুমি যাবে কি? ভাল অনুষ্ঠানই হবে। গেলে আমাকে যদি কষ্ট করে নিয়ে যেতে। ডাক্তারের কথামতো কেউই আমাকে নিতে সাহস পায় না। তুমি যদি পাও!...

সাধারণত বার্ধক্যে মানুষের মনের জোর কমে যায়। সংসার সমাজের ভালো মন্দের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। একটি শীতল নিস্পৃহতা ফুটে ওঠে তাদের আচরণে। কিন্তু তাঁর ভেতরে কোনদিন এসবের ছায়াও দেখা যায়নি। তাঁর যৌবন পার হয়ে গেছে অনেক আগে, প্রৌঢ়ত্ব অপগত। বার্ধক্যের আওতায় দিন কাটছে- এসব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না কখনো। বরং তারুণ্যের উজ্জ্বল প্রাণ প্রাচুর্য প্রকাশ পেত তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে।

একবার তাঁর বাসায় তাঁর জন্মদিনে অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছিলাম আমরা। গানে বাজনায় কথায় গল্পে হাসি হল্লায় মুখর হয়ে উঠেছিলো উৎসব। আর তিনি সবার সঙ্গে সমানভাবে আলাপ করে যাচ্ছিলেন। বয়সে তাঁর চেয়ে সামান্যই ছোট, তাঁর এক আত্মীয়াকে আনন্দের ছলে বলতে শুনেছিলাম- ওঁতো চির নবীন!

আসলেই তিনি তাই ছিলেন। তাঁর কাছে গেলে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনগুলো মনে হতো-

যত দেব প্রাণ, বয়ে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ-

কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার কবিতাতেও প্রাণময়তা, চির নবীনতা, উজ্জ্বলতা, গতিময়তার লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবনের শেষ দিকে এসে যে কবিতাগুলো লিখেছেন তিনি, তাতে শব্দ, উপমা এবং গঠন রীতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে তিনি একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে দৈনিক বাংলার 'মহিলা মহল'-এ ছাপাবার জন্যে ।তার কটি লাইন-

আজ ভিজে দাঁড় কাক শাখার উপরে নিশ্চুপ
শূন্য চাঁপার ডালে হলুদ পাখিটি উদাস,
নীরব নিঝুম যেন স্তব্ধ চারিধার
জানায় একটি কথা
সে নাই সে নাই।

আর যাই হোক, লাইনগুলোতে তাঁর পৌনে এক শতাব্দী বয়স কালের রেখাপাত হয়নি- একথা বলা যায়। তিনি যে কালের মানুষ, তাতে করে আজকের লেখিকাদের মত

www.pathagar.com

চলাফেরার স্বাধীনতা, উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব হয়নি। আজ থেকে প্রায় শতাব্দীকাল আগে জন্মগ্রহণ ক'রে সামান্য প্রস্তুতি, সামান্য রসদ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। সে পটভূমির কথা মনে রাখলে তাঁর অনেক সৃষ্টিই আমাদের চমক লাগায়।

তিনি যেকালে কবিতা সৃষ্টি করেছেন, সেখান থেকে সময় এগিয়ে এসেছে অনেক দূর। সাহিত্য শিল্পের আঙ্গিকে এসেছে অনেক পরিবর্তন। বাক্য বিন্যাস, শব্দচয়ন, তার প্রয়োগ কৌশল একে নতুন বিভূতি দান করেছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ধরন গেছে অনেক বদলে। শিক্ষা-বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদির অগ্রগতি এবং পরিবর্তিত প্রয়োগ রীতি শিল্প সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। একে ভিন্নখাতে বইয়ে দিতে শুরু করেছে, যাকে আমরা অগ্রগতি বলে চিহ্নিত করছি।

অবশ্যি একথা অস্বীকার করার নয় যে, আজকের এই আধুনিক যুগের আধুনিক কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা তাঁদের তৈরী ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েই তাঁদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং একজন সাহিত্যিক অথবা শিল্পীকে মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর সময়, তাঁর পরিবেশে রেখেই বিচার করতে হয় তাঁকে।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা বিদ্যায়তনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তবে গৃহে তিনি একটি উদার শিক্ষিত পরিবেশ পেয়েছিলেন। তাঁর শিল্পীমন সেখান থেকেই রস গ্রহণ করে বর্ধিত হয়েছে। তাঁর কবিতাগুলো যে মানেরই হোক পরিশীলিত গুণে ছিলো সমৃদ্ধ। মানবতাবোধ, প্রকৃতি, রোমান্টিকতা, দেশ, দেশের মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি ইত্যাদি নিয়ে সৃষ্ট কবিতার ভেতরে একটি বিদগ্ধ চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর তেমনি একটি কবিতা 'দারিদ্র মাহাত্ম্য'ঃ

কাজ শেষ হয়
ক্ষুধা ভরা বুকে বলহীন পায়,
আলোহীন বায়ুহীন ঘরে তারে ফিরে যেতে হয়।
সন্ধ্যা আসে, নীলাকাশে, ভেসে ওঠে চাঁদ,
সে জ্যোৎস্না আনেনা মোহ, আনে বিস্বাদ,
মর্মাকাশে গর্জে ওঠে তৃষ্ণার্ত রুক্ষ আত্মা।

তোমার মাহাত্ম্য শুধু বনবাসী সন্ন্যাসীর মাঝে
নহে লক্ষ লক্ষ নরনারী তরে, নহে সংসারের কাজে।

দারিদ্র্য যে কত নির্মম, কত নিষ্ঠুর, দারিদ্র্য যে বিলাস বা বিদ্রোহের উপকরণ নয়, তাই প্রকাশ পেয়েছে কবির এই কবিতায়। দারিদ্র মানুষের দেহের পাঁজর ভাঙে, ভাঙে তার ব্যক্তিত্বের মেরুদন্ড। যে মানুষ তার শিকার হয়, সেই জানে। কবির হৃদয় অনুভব করেছে তা। বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন আন্দোলন রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ ইত্যাদি কবি সত্তাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছে। এই সব আন্দোলন, সংগ্রাম তরুণ সমাজের আত্মত্যাগ তাঁর হৃদয়কে আনন্দে

www.pathagar.com

বেদনায় উদ্বেলিত করেছে।

সেই বারুদের মত ছেলেটি
ইস্পাতের মত দুটো চোখ তুলে
আমাকে বললো,
লেখনা একটা কবিতা জীবনের মুক্তির
আত্মার প্রশান্ত মহিমার।
তার দিকে চেয়ে আমার মনে হল
একটা দেশালাইয়ের কাঠি ধরিয়ে দিলে
ও যেন দপ করে জ্বলে উঠতে পারে।

[সেই বারুদের মত ছেলেটা।]

সেকালের কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার কবিতার শিরোনামগুলোতে আধুনিকতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। যেমন- বিশ্বযৌবন, তুষারাবৃত প্রভাত, দার্জিলিং-এ সন্ধ্যা, ছায়া ঢাকা ফুল, মুক্তি পিয়াসী, কালও সে এসে গেছে, গাহিয়ো তখন গান, তিমির স্তব্ধতা ভাঙি, প্রথম ফোটার স্বপ্নে, তবু পূর্ণ হৃদয় আমার, আমি আছি, অনেক রাতের ফুল, ঈদের চাঁদ ও জীবন, ক্যালেন্ডার, মাটির স্বাক্ষর ইত্যাদি। এই নামকরণের ভেতরে একটি অত্যন্ত পরিশীলিত আধুনিক কবি মন পাওয়া যায়।

তাঁর সময়ের অন্যান্য দু'চারজন লেখিকার মত তাঁকেও একটি সীমাবদ্ধ গন্ডীর ভেতরে বাস করতে হয়েছে। সমাজ তাঁদের পূর্ণ বিচরণের ছাড়পত্র দেয়নি। তাঁদের সৃষ্টিও তাই সীমাবদ্ধতার চাপে সংকুচিত। মাহমুদা খাতুনের কবিতা গুলো পড়ে তাই মনে হয়। অনেক ভাবনা প্রকাশের ছাপ রয়েছে পুরোপুরি দল মেলা হয়ে ওঠেনি। সমাজ-কাল সম্পর্কে সচেতনতা সত্ত্বেও।

তিনি যখন তরুণী মাত্র, সেই সময়ে তাঁর প্রথম বই 'পশারিনী' প্রকাশিত হয়। তৎকালীন মানসী ও মর্ম্মবানীর কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দত্তের সহযোগিতায় এবং কবি শ্রীযুক্ত হরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি সংকলিত হয়।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা 'পশারিনী'র 'নিবেদন'-এ লিখেছেন- এত শীঘ্রই যে কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিব, এমন সাহস ছিলনা।... বাল্য হইতে এ পর্যন্তের কবিতা ইহাতে রহিল। ইহার অধিকাংশ কবিতাই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানির সবটাই আমার নিজের দেখা। এ কারণ ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে, তজ্জন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

পশারিনীর প্রথম কবিতা ছিল 'আহ্বান সঙ্গীত'।

এস জ্যোৎস্না আলোক নিশীথে
এস নব বন তরু-বীথিতে-
এস উচ্ছল গীত-ধারা
এস আকুল স্বপন পারা

www.pathagar.com

এস হৃদয়ে, এস বাহিরে,
এস তৃষিতে এই তৃষিতে!
এযে বিরহ ব্যাকুলা যামিনী;
এস আশার চকিত দামিনী
এস গভীর উদার রাগিনী
এস পরাণে এস আঁখিতে!
আমি বসিয়া রয়েছি এপারে
হেথা আলোক মিশিছে আঁধারে
তুমি মৃদু সঙ্গীতে ভাসিয়া
এস জীর্ণ জীবন তরীতে!
আমি নীরব নয়ন সলিলে
কত ডাকিয়াছি তোমা বিরলে
তুমি স্নিগ্ধ শান্তি বিতরি
এস এস প্রিয় এস হে!

এ যেন বেদনার সুতোয় আনন্দের পুষ্পমালা গাঁথা। কবি নিজের গলায় পরেছেন, অন্যকেও পরিয়েছেন। স্বভাব কবির স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যমানসকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লালন করে গেছেন। খুব কম কবির জীবনেই এটা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মৃত্যুর সামান্য ক'দিন আগেও হাসপাতালের রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি তাঁর শেষ কবিতা রচনা করেছেন।

দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ঘটনা যখন তাঁর মনে রেখাপাত করতো, হৃদয়ের এ্যালবাম থেকে তুলে নিয়ে তিনি তাকে কাব্যরূপ দিয়ে ধরে রাখতে চাইতেন। দেশের, সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতি, আন্দোলন, সংগ্রাম যুদ্ধের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যেতেন। তাই বলি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছিলেন।

একটি কুকুরকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন তিনিঃ

কুকুরটা রোজ এসে-
আমার দুয়ারে বসে থাকতো।
আমরা পালন করিনি তাকে
শুধু মাঝে মধ্যে এক আধটু
রুটির টুকরো ফেলে দিতাম।

কুকুরটা দেখতে সুন্দর ছিলনা,
গায়ে ছোট ছোট কালো লোম
কান দুটো খাড়া,
তবু তার ছোট চোখ মেলে মমতাভরা দৃষ্টি

www.pathagar.com

যখন তুলে ধরত
তখন মন মমতায় সিক্ত না হয়ে পারতনা
তার দৃষ্টি যেন কথা কয়ে উঠত
প্রকাশ করত প্রাণপণে তার কৃতজ্ঞতা।

(কুকুরটা)

'প্রার্থনা' নামে কবিতায় তিনি বলেছেনঃ

এদেশের মাটি ভিজে আছে লক্ষ লক্ষ
দীন মুজুর, মেহনতী মানুষ ধনীর তাজা রক্তে
গ্রাম শহর নগর বন্দরে এমন একটু মাটি নেই
যা মানুষের রক্তে ভেজেনি।
এ কান্নার শেষ নেই
এ দুঃখের শেষ নেই
এ শোক অন্তহীন
আর রক্ত নয়।
আর মৃত্যু নয়।
এদেশের মাটিতে আজ নতুন সূর্যের আলো
সেই আলো মেখে
দাঁড়াবার শক্তি দাও প্রভু।

সব মানুষের জন্যে তাঁর হৃদয় ছিল শান্তিকামী। বিশ্বের প্রতি তাঁর ভালবাসা সব মানুষের জন্যে মমতা তাঁর অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে এবং বিশ্ব মানবতার জন্যে তিনি উচ্চারণ করেছেন শান্তির বাণী। বার্ট্রান্ড রাসেলের মৃত্যুর পর একটি কবিতা রচনা করে তাঁকে উৎসর্গ করেনঃ

শান্তি নিশান উর্ধে তুলে ধ'রে
দুঃসহ কারাবরণ করেছ তুমি
তোমার সে অভিপ্রায় সে শান্তির পায়রা
উড়তে পারলোনা আজো
শয়তানের বেড়াজালে;

তাঁর শেষ রচনা 'একান্ত চাওয়া' কবিতাতেও মানুষের শান্তির জন্যেই তাঁর শেষ প্রার্থনাঃ

যে জীবন জাগাতে চেয়েছি-
তোমরা রেখো তাকে দু'হাতে জড়িয়ে
যেন মানুষ শুধুই শান্তি চায়।

তিনি ছিলেন একটি পরিপূর্ণ কবি মনের অধিকারী। তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে কৃত্রিমতা আরোপের সুযোগ ঘটেছে কম। সেটা ভালো কি মন্দ তা পরের কথা। তবে সমাজ এবং

www.pathagar.com

কালের প্রেক্ষিতে তিনি এক উজ্জ্বল সত্ত্বা।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা এখন আমাদের কাছে এক ইতিহাস। সুতরাং সেই ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় নাড়াচাড়া করতে পারি। আমরা কোন কোন অধ্যায়ে পেয়েছি-

স্মৃতির প্রদীপ একা জ্বলে
আমি তার নীচে বসে অন্ধকারে একা।
অন্য কোথা অন্য কোনখানে

কখনো কখনো তাঁকে দেখা গেছে আনমনা।

দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন- হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

তিনি যেন নিঃসঙ্গ এক দ্বীপের অধিবাসী। নিঃসঙ্গ বলতে অত্যন্ত সাধারণভাবে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। কেননা, তিনি তো সবসময় আত্মীয় স্বজন পরিবৃতা ছিলেন। আর আত্মীয় স্বজন পরিবৃতা এই মানুষটি কুমারী জীবন কাটিয়ে গেলেন। সেখানেই তাঁর নিঃসঙ্গতা। কপোতী এবং ক্রৌঞ্চী জীবন থেকে বঞ্চিতা। তাঁর জীবনের সে শূন্যতা মাঝে মাঝে অবকাশময় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দু'একটি অসাবধান কথায় আচমকা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মুখ ফুটে। কিন্তু সেই জীবনের চারপাশে স্বতন্ত্র এক জগত সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। সেখানে কবিতাই ছিল বুঝি তাঁর জীবন সঙ্গীঃ

যেখান হইতে তার
ইঙ্গিত আসে
আর ভেসে চলে
আকাশে বাতাসে
আমার মনের পাখি
তারি সাথে
গান গেতে চায়।

প্রকৃত পক্ষে-

"অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন,
তার বক্ষে বেদনা অপার।"

সারা জীবন তিনি সেই আনন্দ আর বেদনা একই সঙ্গে বয়ে বেড়িয়েছেন। উপভোগ করেছেন নিজে- অন্যদেরও দিয়েছেন সে উপহার।

www.pathagar.com

অন্তরে গাঁথা | নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান। অসুস্থ তিনি। বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে কেউ কেউ যান দেখতে। একদিন একজন গিয়ে তাঁর কুশল জানতে চওয়ার মত করে বললেন- কেমন আছেন?

- ভাল। তবে নড়াচড়া বারণ, এই যা।

আরেকদিনের কথা- জিজ্ঞেস করলেন একজন ওইভাবে ওই একই কথা, কেমন আছেন তিনি। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে জবাব দিলেন, আজরাইল জানালা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে, ভেতরে প্রবেশ করছে না এখনও।

তাঁকে দেখে এসে খুব বিস্মিত ভাবে একজন মন্তব্য করছিলেন- অদ্ভুত মানুষ তো! এমন নিস্পৃহতা! মৃত্যুর দুয়ারে পা রেখে এমন রসিকতা করতে দেখিনি কখনো। তাঁর এমনি মন্তব্য করার কারণ, তিনিও অন্যান্যদের মত দেখতে গিয়েছিলেন তাঁকে হাসপাতালে। পাশের ঘরে রেডিও অথবা টেলিভিশনের সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছিলো। গানের সেই আওয়াজ এমন চড়িয়ে দেয়া ছিলো, ঠিক যেন অনুষ্ঠানটি স্থনীয়ভাবে পাশের ঘরের। সুতরাং সেই ভিজিটর ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে শয্যাশায়ী তাঁকেই প্রশ্ন করে বসলেন- গান কোথায় হচ্ছে?

সহাস্যে খুব মৃদু কণ্ঠে (কেননা, অত্যন্ত দুর্বল তখন–) তিনি জবাব দিলেন, এই ধরুন আমি, আমার মৃত্যুর পর একটা শোকসভা হবে তো, তারই মহড়া হচ্ছে হয়তো!

কথাগুলো বলছি সদ্য প্রয়াত প্রখ্যাত সাংবাদিক, সহিত্যিক এং শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান সম্পর্কে।

কিন্তু মৃত্যু শয্যয় শুয়ে তাঁর এ রসিকতাময় কথাগুলো কি জীবনের প্রতি নিস্পৃহতা! অথবা জীবনকে অনেক ভালবেসে অমোঘ মৃত্যুর প্রতি একটি নিবেদিত মনোভাব! রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, জীবন আমার এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়/মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়!

অবশ্যি সাধারণভাবে দেখতে গেলে- ভারী অদ্ভুত একটি দুর্জ্ঞেয় জীবন যাপন করে গেলেন নাজিরুল ইসলাম সাহেব। কাউকে জানতে দিলেন না তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তেমন কিছু। কোথায় তাঁর আত্মীয় স্বজন, কেউ বলতে পারলো না। দীর্ঘদিন ঢাকার একটি হোটেলে বসবাস করে গেলেন। অনেক আগেই তাঁর নাম শুনেছিলাম। তিনি বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমিও তাই। সুতরাং তাঁর যশ খ্যাতি আমাকে অত্যন্ত গর্বিত করে তুলতো। পত্র-পত্রিকা অফিসে আসতেন তিনি মাঝে মধ্যে। প্রথম দেখেছিলাম

www.pathagar.com

পাকিস্তান আমলে তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান' (বর্তমান দৈনিক বাংলা) অফিসে। পরিচয় হওয়ার পর তিনি আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এর অল্প কিছুদিন পরে আরও একদিন এলেন। সেদিন আবার জিজ্ঞেস করলেন- তোমার বাবা কেমন আছেন?

বোঝা গেল তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অথবা তিনি নিজের ভেতরেই সমাহিত তখন। তাঁর সুদর্শন চেহারা এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু পোশাক পরিচ্ছদের সুনাম শুনেছি আগে। তখনো দেখলাম বৃদ্ধ বয়সেও তা শিথিল হয়নি। বরং যাকে বলে টিপ্‌টপ্‌ স্মার্ট এক বৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আলাপ-আলোচনা থেকে মনে হয় সমাজ সংসারের প্রতি তাঁর অন্তরে একটি নিগূঢ় অভিমান বুকের কোথায় গভীর এক ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। যা তাঁর নিজের প্রতি রসিকতার ভেতর দিয়েও মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট ঘনিষ্ট ছিলেন। দুজনের সম্মিলিত একটি ছবি ছাপার প্রসঙ্গ উঠেছিল একবার, তাঁর সামনেই। শুনে তিনি বললেন- নজরুলের ছবি তো ছাপা হবে, কিন্তু পাশের লোকটির কি হবে?

- তাঁর ছবিও ছাপা হবে। বললেন সংশ্লিষ্ট একজন।

শুনে যেন একটি বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে। বললেন- কোন্ গুণে?

ভেতরের গোপন ক্ষুব্ধ অভিমানে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেননি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাই তাঁর শেষ কৃত্যের সময়ও কাছের দূরের কোন আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিছু সাংবাদিক, সাহিত্যিক তাঁর প্রতি সে কর্তব্য পালন করলেন এবং শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। অনেক ব্যবধান সত্ত্বেও লেখক লিউ টলস্টয়ের মৃত্যুর চিত্রটি পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় যেন। বেওয়ারিশ এক চিত্র।

অনুমান করা হয় তাঁর অনেক অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি রয়েছে এবং সেগুলো রয়েছে সম্ভবত তাঁর দীর্ঘ নিবাস সেই হোটেল কক্ষে। আমরা মনে করি এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগী হওয়া উচিত।

সব শেষে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের এই বিরল চরিত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁকে হারাবার শোক বেদনা অনাত্মীয় আপনদের সবার অন্তরে অন্তরে গাঁথা রইলো।

www.pathagar.com

আমাদের ঋণ | মোহাম্মদ মোদাব্বের

আমার বয়সের অনেকের মতই মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 'মুকুলের মহফিল'-এর বাগবান ভাই হিসেবে। মফঃস্বল শহর বগুড়া। স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়ার সময় থেকে আমার দাদু 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা রাখতেন। দাদুর কোলের কাছে বসে আজাদ এর মুকুলের মাহফিল-এ প্রকাশিত রকমারী কবিতা-ছড়া গল্প পড়তাম। খুব মন দিয়ে পড়তাম বাগবান ভাইয়ের চিঠি। সে চিঠিতে কত উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা। তখনি ইচ্ছা জাগে আমিও কিছু লিখবো। দু একটা ছড়া, গল্প, লিখতে শুরু করি। শোনাই দাদুকে। তিনি তো যাই লিখি বলতেন- বাহ্ বেশ সুন্দর হয়েছে তো! উৎসাহ পেয়ে আমি মাঝে মাঝে সময় পেলেই লিখতাম।

১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রী আমি। তখন আমার এক ফুফুর সম্পর্কে আত্মীয় কবি তালিম হোসেন কলকাতায় থাকতেন। কবি হিসাবে তখন তাঁর খুব নাম। 'আজাদ' এবং অন্যান্য পত্রিকায় অনেক লেখা ছাপা হয়। একদিন তিনি বগুড়ায় এলে অনেক সংকোচভরে তাঁকে আমার গল্প লেখার খাতাটি দেখালাম। তিনিও খুব উৎসাহ দিলেন এবং খাতা থেকে বেছে 'দীনু দাদু' নামে একটি গল্প আমাকে কপি করে দিতে বললেন।

কলকাতা তিনি ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই 'মুকুলের মহফিল'এ সেই লেখাটা ছাপা হয়ে যখন আমাদের বাড়িতে এলো- তখন সে এক উৎসব। পরে তাঁর চিঠি এলো। 'বাগবান ভাই' এর নাকি আমার লেখাটা খুব ভালো লেগেছে এবং তিনি আমাকে আরো লেখা পাঠাতে বলেছেন। আমার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তখনো কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম এই 'বাগবান' ভাইয়ের সঙ্গে শীগগিরই একদিন এক সঙ্গে বাস করবো!

মোহাম্মদ মোদাব্বের সম্বন্ধে বলার মত আমার ব্যক্তিগত এত কথা, এত স্মৃতি রয়েছে যে, দু'চার কথায় তা শেষ করা আমার পক্ষে কষ্টকর। বহুদিনের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা তাঁর পরিবারের সঙ্গে। সেই ১৯৪৯ সালে আমি কলেজে পড়তে ঢাকায় এলাম। তখন আমার বিয়ে হয়েছে। মোদাব্বের ভাই সপরিবারে চলে এসেছিলেন কলকাতা থেকে ঢাকা। তালিম হোসেন কলকাতার জীবনেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ট। ঢাকায় বেশ কিছুদিন আমরা এক সঙ্গে একই বাড়িতে থেকেছি। মোদাব্বের ভাই এবং ভাবী তখন হয়ে গেলেন যেন এই নব-দম্পতির অভিভাবক। কলেজে যাবার সময় খেয়ে গেলাম কিনা এবং এসে কি খাবো- ইত্যাদির খোঁজ খবর রাখাও ছিল যেন ভাই এবং ভাবীর দৈনন্দিন সাংসারিক কাজ কর্মের অন্তর্ভূক্ত!

বিভাগ পূর্ব কালের জাঁদরেল সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের ঢাকায় এসে 'অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান' নামে তাঁর নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। আমাদের মিলিত

www.pathagar.com

বাসস্থান ৩২ নং পুরনো মোগলটুলির বাড়িরই নীচের তলায় তিনি এই পত্রিকার জন্যে প্রেস স্থাপন করেছিলেন।

কিছুদিন মোদাব্বের ভাইয়ের সঙ্গে থাকার পর আমরা একই পাড়াতে আলাদা বাড়ি নিয়ে উঠে যাই। একদিন বিকেল বেলা তাঁর বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। দেখি, মোদাব্বের ভাই তাঁর রুটিন অনুযায়ী কাজ করছেন। ওদিকে ভাবীও কর্মব্যস্ত। সংসারের কাজকর্ম গুছিয়ে তিনি টাইপ করা, ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্টা মিলিয়ে কাগজ ভাঁজ করা, গ্রাহকদের ঠিকানা লেখা, প্যাকেট বাঁধা, টিকিট লাগানো এবং ঠিকানা অনুয়ায়ী পত্রিকা পাঠানো হচ্ছে কিনা এসব দিক দেখতেন অফিসিয়াল কাজের মতই। তাঁদের বাচ্চা ছেলে মেয়েরাও বসে যেতো এসব কাজ কর্মে সাহায্য করতে। পুরা দস্তুর একটি কর্মব্যস্ত অফিস চলছে যেন অথচ কোন কর্মচারী নেই। নিজেরা মালিক নিজেরাই কর্মচারী।

ভাইয়ের ভক্ত অনুরক্ত অনেকেই আসতেন দেখা করতে। তিনি হাতের কাজ ফেলে কথা খুব একটা বলতেন না। একবার চেয়ে শুধু হয়তো বলতেন- বসো। আর কিছু না। তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল এমন যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আপন জনেরাও, তিনি কথা বলবেন এমন ফুরসৎও মেজাজ না বোঝা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। অনেককে দেখেছি কোন না কোন কাজে সাহায্যে লেগে পড়তে। শেষে যখন তিনি ফুরসৎ হতেন কথাবার্তা এবং খোশগল্প শুরু করতেন। তখন মনে হতো তাঁর চেয়ে প্রিয়ভাষী খোশ মেজাজী মানুষই আর হয় না!

আমরা পৌছাবার কিছুক্ষণ পর ভাই-ভাবী অবসর হলেন। গল্প গুজব শুরু হলো। চা খেলাম একসঙ্গে। সেই সময় দৈনিক মিল্লাত প্রকাশের আয়োজন চলছিলো। মোদাব্বের ভাই-ই তার সম্পাদক পদে বহাল হয়েছেন। তাঁকে তার অফিস প্রতিষ্ঠা, কাগজ বের করার প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি করতে হচ্ছে। এদিকে রয়েছে তাঁর নিজের পত্রিকার কাজ। সুতরাং খুব ব্যস্ত। খেয়েই তিনি আবার তাঁর কাজের ভেতরে ডুবে গেলেন। মেঝেয় মাদুরের ওপরে বসে কাজ করছিলেন। মাদুরের চারদিকে ছড়ানো প্রুফশীট, নানা জায়গা থেকে পাঠানো রিপোর্ট, নিবন্ধ, সাপ্তাহিক দৈনিক মিলিয়ে অনেক কাগজ। একপাশে হাতের কাছেই একটি ছোট্ট ট্রানজিস্টার। মাঝে মাঝে চালিয়ে শুনছেন, আবার বন্ধ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন ও ম্যাটার তৈরির কাজ। যেন মেশিনের স্পীডে চলছে তাঁর সম্পাদনা।

মোদাব্বের ভাই আমার কাছে আগাগোড়াই ছিলেন বিস্ময়, হয়তো অনেকের কাছেই। 'মুকুলের মহফিল' এর পরিচালক 'বাগবান' আর মোহাম্মদ মোদাব্বেরের ভেতরে মিল খুঁজে পাওয়া যেন সহজ ব্যাপার ছিল না। তাঁকে যতই দেখেছি, ততই অবাক হয়েছিল। লম্বা এক হারা মানুষ। অপরিসীম পরিশ্রম ক্ষমতা। কথা কম, কাজ বেশী, অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব!

ভাবীর কাছে বসে কথা বলছি, হঠাৎ ডাক দিলেন আমার ডাক নাম ধরে- রাণী, এসোতো, লেখো। বলেই নিউজ প্রিন্টের একটি প্যাড ঝপ্ করে রাখলেন আমার সামনে। কাজ করার সময় এক হাঁটু মুড়িয়ে বসতেন তিনি। এবং ক্ষিপ্রহাতে কাজ করে যেতেন। ডাকের সাথে সাথে আমি গিয়ে বসে পড়লাম তাঁর সামনে মাদুরে। কলম এগিয়ে দিয়ে বললেন- লেখো।

বলে যেতে লাগলেন তিনি আর আমি ঝুঁকে পড়ে লিখতে লাগলাম যতটা সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে। ধীরে সুস্থে লিখতে গেলে হয়তো ধমক খেতে হবে। বেশ ক'পাতা লেখার পর হাত

www.pathagar.com

বাড়িয়ে বললেন- দাও। যা লিখেছিলাম তুলে দিলাম তাঁর হাতে। চোখ বুলালেন, কিছু বললেন না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন ভাবান্তর না দেখে আরো কিছুক্ষণ বসলাম। ধীরে ধীরে এক সময় বললাম- যাবো? বললেন, যাও।

এর দিন কতক পরে একটি খাম এলো ডাকে। ওপরে আমার নাম। খুলে দেখি এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমার নামে। 'দৈনিক মিল্লাত'-এ আমার চাকরি মহিলা বিভাগ পরিচালনার। এ তারই নিয়োগপত্র।

চিঠি খানা পেয়ে তাঁর বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে প্রথমে কিছুই বললেন না। আমিই বললাম- 'মিল্লাত' থেকে একটি চিঠি পেয়েছি।

- বেশ। সহজ কণ্ঠে বললেন।

- কি করতে হবে আমাকে?

- অফিসে এসো কাল এগারটার দিকে।

কাগজের অফিসে একজন মেয়ে যাওয়া খুব সচরাচর ব্যাপার ছিল না তখন। কিন্তু এইভাবেই সাংবাদিকতায় প্রথম প্রবেশ আমার। এইভাবেই সংবাদপত্রে আমার প্রথম চাকরি তাঁরই স্নেহছায়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা তখন একশ'র বেশী হবে না। তাদের চলাফেরা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত। ক্লাসের ঘন্টা পড়লেই ওই ক্লাসের স্যার এসে দাঁড়াতেন কমন রুমের সামনে, আমরা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকতাম মাথায় ঘোমটা দিয়ে। স্যারকে দরজার সামনে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে তাঁর পিছু পিছু ক্লাসরুমে যেতাম। গিয়ে স্যারের টেবিলের সামনের বেঞ্চটিতে বসতাম। মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল ওটা। এবং কোন ক্লাসেই এক বেঞ্চ মেয়ের বেশী সংখ্যা হতোনা আমাদের।

ক্লাস শেষে আবার স্যারের সঙ্গেই বেরিয়ে আসতাম। তিনি আমাদের কমনরুমে পৌঁছে দিয়ে চলে যেতেন টিচার্স রুমে।

এমনি পরিবেশে একটি কাগজের অফিসে চাকুরী হলো আমার। সেই পুরনো ঢাকায় কোর্টের পেছনে একটি বাড়িতে ছিল 'দৈনিক মিল্লাত' অফিস। অবশ্যি সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন অফিসে যেতাম। গেট দিয়ে ঢুকে কোনদিকে প্রায় না তাকিয়ে সোজা গিয়ে উঠতাম সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের সাহেবের কামরায়। মহিলা বিভাগের সম্পাদিকার বসার আলাদা কোন স্থান ছিল না। সম্পাদক সাহেবের কামরায় তাঁর টেবিলের সামনে একটি চেয়ারে গিয়ে বসতাম। সংগৃহীত লেখার প্যাকেটটি ব্যাগ থেকে বের করে তাঁর সামনে রাখতাম। তারপর হয়তো এক কাপ চা খেয়ে চলে আসতাম।

প্রতি শুক্রবার 'মিল্লাত'-এর মহিলা বিভাগ প্রকাশিত হতো। ওপরে লেখা থাকতো- পরিচালিকাঃ মাফরুহা চৌধুরী এবং বেতন পেতাম মাসে পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু কিভাবে পরিচালিত হয়ে বিভাগটি ছাপা হলো সে সমাচার আমার তখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এমনিভাবে কেটে গেছে বেশ কিছু দিন।

মোদাব্বের ভাই ইতিমধ্যে আমার পাতার লেখাগুলো এডিট করার ভারও দিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু একবার এক কান্ড ঘটে গেল। মহিলা বিভাগের এক সংখ্যায় একটি টিউটোরিয়ালের প্রশ্নসহ লেখাটি ছাপা হয়ে গেল। কাগজ খুলে দেখে লজ্জায় যেন মাথা কাটা গেল। ভয়ও পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম মোদাব্বের ভাইয়ের কাছে কিভাবে কৈফিয়ৎ

www.pathagar.com

দেবো। আমি লেখাগুলো মোটামুটি দেখে শুনে এডিট করে দিতাম, তা সত্বেও তাড়াতাড়িতে কখন চোখ এড়িয়ে গেছে।

অফিসে যেতেই কাগজটি বের করলেন তিনি। জায়গাটা আন্ডার লাইন করে রেখেছেন আগেই। দেখালেন। আমার খুব সংকুচিত অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন। তাতে ভয় কাটলেও লজ্জা গেল না। তবে আর কখনো এ ধরনের কিছু ঘটেনি। যাই হোক অন্যান্য দিনের মত সেদিনও সম্পাদক সাহেবের কাছে লেখা জমা দিয়ে চলে আসছিলাম, হঠাৎ একজন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। একটি কলম হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন- আপনি এ কাজের কি কিছু বোঝেন?

অত্যন্ত আকস্মিক এ আক্রমণ। কিন্তু কোন কিছু জবাব দেবার আগেই দেখা গেল সম্পাদক সাহেব বেরিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোককে তিনিই বললেন, তুমিই বা কি এমন ঘোড়ার ডিম বোঝ!

ভদ্রলোক সম্ভবত ওই অফিসেরই ষ্টাফ। কিন্তু তিনি ঠিক কে ছিলেন, আজ কিছুতেই তা মনে করতে পারছি না। সেদিনে অফিসের পরিবেশে একজন মহিলার পক্ষে সহসাই কারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ছিল না- অফিসের কলিগ হওয়া সত্ত্বেও।

মোহাম্মদ মোদাব্বেরের আচরণে অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝতেন। কঠিন রুক্ষ মনে হতো তাঁকে হয়তো। কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরা জানেন, গুরু গম্ভীর অথবা রুক্ষ বহিরাবরণের অভ্যন্তরে শিশুর মত সরল এবং পিতার মত স্নেহময় একটি মন বিরাজ করতো। তার পুরোপুরি স্পর্শ আমি আগাগোড়াই পেয়ে এসেছি।

তাঁর চরিত্রের আরও দিক রয়েছে, তা হলো নিঃস্বার্থ সমাজ সেবীর, নির্ভিক রাজনৈতিক কর্মীর। বৃটিশ শাসন আমলে রাজনৈতিক কারণে তিনি দুইবার কারাবরণ করেছেন। নির্ভিকতা, সাহসিকতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই নির্ভিকতা কর্মক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক নির্ভিক বেপেরোয়া সাংবাদিক। মোহাম্মদ মোদাব্বের কথা বলতেন কম, কাজ করতেন বেশী এবং কাজের সময় কেউ- তিনি যেই হোন না কেন, অপ্রয়োজনে তাঁকে প্রাধান্য দেবার স্বাভাব ছিল না তাঁর।

মোহাম্মদ মোদাব্বেরের ব্যক্তিত্বে একটি আকর্ষণী ক্ষমতা ছিলো। যার জন্যে অনেক সময় তাঁর কাটখোট্টা রুক্ষ আচরণ সত্ত্বেও অনেকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। অনেকে তাঁর সাহায্য এবং সহযোগিতা লাভ করেছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্র ছাড়াও অতীতের এবং আজকের আমরা অনেকেই কোন না কোন ভাবে তার কাছে ঋণী। আজকের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের অনেকেরই হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর কাছে।

www.pathagar.com

নক্ষত্র পতন | মওলানা ভাসানী

উনিশশো ছিয়াত্তর সাল। এক জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রের পতন ঘটলো। লোকান্তরিত হলেন এ দেশের বিরাট এক পুরুষ- মহান জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

সব মৃত্যুই মৃত্যু এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবু কোন কোন মৃত্যু আমরা হঠাৎ করে মেনে নিতে পারি না। হতাশায় বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমাদের চোখে আলোর ঔজ্জ্বল্য কমে আসে। দিশেহারা মনে হয়।

মওলানা ভাসানীকে হারিয়ে সেই অনুভূতিই জেগেছে আমাদের মনে। জাতির জীবনের এক ক্রান্তিলগ্নে তাঁকে হারিয়েছি আমরা। তাঁর বক্ষ ছিল সব শ্রেণীর মানুষের নির্ভয় আশ্রয়স্থল। তাঁর সেই বুকের আশ্রয় চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল। বিশাল এক পিতৃত্ব বিরাট এক অভিভাবকত্বহারা হয়ে গেল এদেশের সব শ্রেণীর মানুষ।

তাঁর সম্বন্ধে যেমন পড়েছি কাগজে পত্রে, রেডিও টেলিভিশন মারফত তাঁর কণ্ঠ যেমন শুনেছি এবং তাঁকে যেমন দেখেছি, তাতে এই কথাই মনে হয়েছে, বাংলাদেশের অনন্য প্রতীক মওলানা ভাসানী। বাংলাদেশের সুখ-দুঃখ, বন্যা-দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ-বিপ্লব, স্বাধীনতা-শান্তি সব আকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর জীবনের প্রান্তরে প্রত্যন্ত প্রদেশে। কখনো তিনি শান্তির দূত কখনো তিনি বিদ্রোহের দাবানল। এক সময় বিদেশী এক সংবাদপত্র তাঁকে উল্লেখ করেছিল 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স'।

তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। অতি সাধারণ লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, টুপি, চটি পরিহিত এক মানুষ কি করে একটি দেশের রাজনীতির রূপরেখা নির্মাণ করতে পারেন, নির্ণয় করতে পারেন! কি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর অনুগামী হতে পারে! কি করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করতে পারেন একক প্রচেষ্টায়!

তাঁর কুড়ে ঘরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছেন, তাঁর সাক্ষাৎ প্রত্যাশায়। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ছোট্ট মাটির আঙ্গিনায়। বিদেশী সাংবাদিকরা এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন, তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন।

বেড়ার তৈরী জীর্ণ কুঁড়ে ঘর, আসবাবের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে তৈরী খান কয়েক চেয়ার, টুল, বেঞ্চ। শোবার ঘরে এক চৌকি ছাড়া কোন আসবাব নেই। কিন্তু দেশ বিদেশের মানুষ গিয়ে ঐসব পুরনো, রঙচটা, ভাঙাচোরা, অত্যন্ত কমদামী টুল বেঞ্চ, চেয়ারেই বসেন। তখন তাঁর চারপাশের সব পরিবেশের মাঝে তাঁকে হয়তো এক

www.pathagar.com

অলৌকিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছে তাঁদের।

সেই বারই প্রথম দেখি তাঁকে। কলেজে পড়ি তখন। রিকশা করে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একটি রব উঠলো পথে- মিছিল আসছে, মিছিল!

দুপুর বেলা, মাথার ওপরে খাড়াভাবে দাঁড়িয়েছে সূর্য। তাপ বিকীরণ করছে দোর্দন্ড প্রতাপে। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসছে মানুষের সারি! মিছিল!

কিন্তু, মিছিলের শ্লোগান কোথায়। তাড়াতাড়ি রিকশা থেকে নেমে রাস্তার এক পাশে দাঁড়ালাম। জনপ্রবাহ এগিয়ে আসছে। কিন্তু একেবারে চুপচাপ। শুধু পায়ের শব্দ। মৌন মিছিল।

মিছিলের অগ্রভাগে এগিয়ে আসছেন বলিষ্ঠ শ্মশ্রুমন্ডিত বর্ষীয়ান এক পুরুষ। সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। উঁচু প্রশস্ত বুক। যেন বুক চিতিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন নির্ভিক। সবার সামনে দাঁড়িয়ে বরাভয় দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বিশাল এক জনতাকে।

এর অনেকদিন পর, হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়েছিলাম সন্তোষ যাবার। সন্তোষে মওলানা সাহেবের কয়েকদিন ব্যাপী মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে নজরুল একাডেমী আমন্ত্রিত হয়েছিলো। নজরুলের হামদ নাতের একটি জলসা পরিবেশন করার জন্যে। নজরুল একাডেমীর একজন সদস্য হিসেবে আমিও গিয়েছিলাম সন্তোষে। যেন অদ্ভুত এক কাহিনীর দেশ। তাঁর অতিথিপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। এত কাজের ভেতরে তাঁর লোকরঞ্জক অনুষ্ঠান প্রীতিতে বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন।

বেড়ার ঘর, মাটির আঙিনা এবং সামনের পথটি আমার চোখে এখনো ভাসে। ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে সরু পায়ে- চলা পথ। ভেতরে ঢুকে প্রথমে একটি মোটামুটি খোলামেলা আঙিনা। সামনে তাঁর বাসের ঘর। ঘরের ওপাশে পাকের চালা। সেখান থেকে সিদ্ধ ধানের সোঁদা গন্ধ আসছে, কখনো ডাল সম্ভারের গন্ধ। আঙিনায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, সাংবাদিকরা বসে রয়েছেন। কেউ কেউ একপাশে দাঁড়িয়ে, বসার স্থান সঙ্কুলান হয়নি তাঁদের।

মওলানা সাহেবের উপদেশ পরামর্শ প্রত্যাশী তাঁরা। কেউ যাচ্ছেন, কেউ আসছেন। তাদের পরনে আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদ। তাঁরা অনেকে এসেছেন নিজেদের গাড়ি নিয়ে। অথচ এসে প্রবেশ করেছেন এক জীর্ণ কুটির প্রাঙ্গণে। এটাই তাঁদের লক্ষ্যস্থল। গন্তব্যস্থল। যাঁর কাছে এসেছেন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-পরামর্শের জন্যে, পোশাকে পরিচ্ছদে তিনি এক দরিদ্র গৃহস্থ যেন। আদর আপ্যায়নে এক অতিথিপরায়ণ সহৃদয় গৃহস্বামী। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন চমচম দিয়ে আতিথ্য করছিলেন তিনি। আমরাও পেয়েছিলাম একটি করে চম চম। চমচম ফুরিয়ে গেলে, হয়তো দুখানা কি একখানা করে স্থানীয় দোকানের বিস্কুট। বিস্কুট না থাকলে পেয়াজ মরিচ নুন তেল দিয়ে মাখানো মুড়ি। কিন্তু কিছু মুখে না দিয়ে কেউ উঠতে পারতো না।

একবার এক সাংবাদিক একজন বিদেশী দর্শনার্থী অতিথিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর

www.pathagar.com

কাছে। ঘরে ডিম ছিলো। উপস্থিত মতো তাই অতিথিদের পরিবেশন করার ব্যবস্থা বলে দিলেন বাড়ির ভেতরে। বললেন, ডিম ভেজে (মামলেট) দিতে। বলে, তিনি এদিকে এসে কথা বলছেন এঁদের সঙ্গে, এমন সময় ছোট্ট একটি মেয়ে এসে তাঁর কানের কাছে ধীরে ধীরে বললো- ডিম ভাজবে, পেয়াজ তো নেই!

- পেয়াজ ছাড়াই ভাজতে বলো।

আসলে পুরো বাংলাদেশ ছিল তাঁর সংসার। সুতরাং তাঁর কাছে এগুলো ছিলো অতি ক্ষুদ্র বিষয়। বাংলাদেশ নামক সংসারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করেছেন তিনি সারাজীবন। সারাদেশে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সুখ দুঃখ অভাব-অভিযোগ, দারিদ্র দৈন্য তদন্ত করেছেন, তদবীর করেছেন। তাদের পাওনা, দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সবকিছু মোকাবিলা করতে গিয়ে তাঁর বলিষ্ঠ মুষ্ঠি উর্ধে উত্তোলিত হয়েছে, কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে হুংকার, উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদে। বিশ্বের দরবারে জানিয়েছেন প্রখর আর্জি, দাবী করেছেন প্রতিকারের। এবং বিভিন্ন সময়ে বিশ্ব জনমত তৈরী করেছেন বাংলাদেশের পক্ষে।

মওলানা ভাসানীর বুকের ভেতরে শুধু বাংলাদেশের একটি মানচিত্রই রক্ষিত ছিলনা, সেখানে অবস্থান করত একটি সচল বাংলাদেশ। কয়েক কোটি মানুষের মুখ।

www.pathagar.com

চোখ মুছিলে জল মোছেনা | আঙ্গুর বালা দেবী

১৯৭১-এ দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক জ্ঞানীগুণী শিল্পী সাহিত্যিক এসেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের অতিথি হয়ে বাংলাদেশ দেখার জন্যে। মুক্তিযুদ্ধে জাতির নবজন্মের পর ধীরে ধীরে অন্যান্য সব কিছুর সঙ্গে দেশের আনন্দ উৎসবের পরিবেশ নতুন পলির ওপরে আবার সমৃদ্ধ আকারে গড়ে উঠতে লাগলো। ১৯৭৪ সাল। ঢাকার নজরুল একাডেমী স্থির করলো, তার নজরুল জয়ন্তী এবং প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কলকাতা থেকে নজরুল-সংগীতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কাউকে কাউকে অতিথি করে আনবে। আনা হলো নজরুলের একান্ত শিষ্য এবং ঘনিষ্ট সহকর্মী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং নজরুল-সংগীত-সম্রাজ্ঞী আঙ্গুরবালা দেবীকে।

আঙ্গুরবালা দেবীর ছবি প্রথম দেখেছিলাম আমাদের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন-এর বাড়িতে। দেয়ালে একই চিত্রে তাঁকে নিয়ে ক'জন শিল্পীর এবং আঙ্গুরবালার আলাদা-আলাদা আলোকচিত্র। যখনই যেতাম সে-বাড়িতে ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। কেমন এক প্রাচীন ঐতিহাসিক সুবাস উপভোগ করতাম।

সেই আঙ্গুরবালা দেবী। কিন্তু কি মিষ্টি চেহারা, ছবির সঙ্গে কিছুরই মিল নেই। হাসি লেগেই থাকে মুখে। কাঁচা-পাকা ঢেউ তোলা চুলের খোঁপা, মাথার ঘোমটার ফাঁকে কপালের ওপরে ভাঙা ভাঙা কোঁকড়ানো চুল বেরিয়ে আছে। গলায় সরু চিকন নেকলেস, সরুচুড়ি, আংটি, কানে সাদা পোখরাজের টপ। গায়ের রঙ ঘন শ্যামল। সব মিলিয়ে অপূর্ব লাবণ্যময় শুচিস্মিতা।

নজরুল একাডেমী ভবনে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো। আমার এবং আমাদের মতো আরো যারা একাডেমীর সঙ্গে জড়িত তাঁর সঙ্গে তাদের আলাপের সুযোগ হয়ে উঠছিলো না। সংগীতানুরাগী এবং অনেক দর্শনপ্রার্থীদের ভিড় জমে উঠেছিলো।। এক সময় শবনম মুশতারী আলাপ করিয়ে দিলো আমাকে তাঁর সঙ্গে- আমার আম্মা!

খাটের ওপরে নিজের বিছানাতে বসেছিলেন তিনি। আলাপ করে দিতেই প্রসন্ন হাসি মুখে পাশে স্থান দেখিয়ে বললেন- বোসো। এখানে বোসো।

- থাক্। আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হলো। এখন যাই। পরে আসবো।

- না। তোমার সঙ্গে আলাপ করি। আমার ভালো লাগছে।

www.pathagar.com

- কাছে বসলাম। মামুলি কিছু কথাবার্তা হলো।

নজরুল একাডেমী ভবনে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে আমার এবং শবনমের বাসা থেকে এবং প্রতিদিনই সকালে বিকেলে একাডেমী ভবনে হাজির হওয়া চাই আমার।

নজরুল একাডেমীর অনুষ্ঠান ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে হবে পরপর তিন রাত। এই অনুষ্ঠানে তিনি প্রথম রাতেই গাইলেন সম্ভবত পাঁচটি গান। সামনে বসে তাঁর কণ্ঠে গান শোনা, জীবনের এক পরম লগ্ন বলে মনে হলো। বাণী, সুর এবং কণ্ঠের গায়কী সব মিলিয়ে অপার্থিব মনে হচ্ছিলো। সুরে সুরে ভরে গিয়েছিলো বিরাট হলটি। সুর ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিলো এক সম্মোহিত পরিবেশ। যে কটা গান তাঁর কণ্ঠে শুনেছি, যেমন- 'যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই', 'তোমার বুকের ফুলদানিতে', 'ওই ঘর ভুলানো সুরে', 'চোখ মুছিলে জল মোছে না', 'চৈতী রাতের উদাস হাওয়া' ইত্যাদি। সেই কণ্ঠের সুর এখনো কানে বাজে, সেই নিবেদিত রূপ চোখে ভাসে। এই অনুষ্ঠান ছাড়াও টেলিভিশন সাক্ষাৎকারসহ গান রেকর্ডিং, দু'একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছিলো তাঁর জন্যে- এগুলোর প্রায় সব গুলোতেই তাঁর সঙ্গে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার।

ধীরে ধীরে অদ্ভুতভাবে ঘনিষ্ঠ করে নিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা। ভক্ত এবং কাগজের লোকদের আনাগোনা, দর্শন প্রার্থীদের চাপ- ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে বাইরে একজনকে পাহারায় রাখা হলো। ঘরে কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। আড়াআড়ি ভাবে দুই খাট বিছানো। দুই বোন দুই খাটে শুয়ে। আমি সামনে একটি চেয়ারে বসে আছি। জিজ্ঞেস করছিলেন, আমার চাকরি, লেখাপড়া, মা-বাবা, দেশের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি ইত্যাদি নিয়ে। কথা বলতে বলতে এক সময় হাই উঠেছে আমার, সঙ্গে সঙ্গে এক পাশে সরে গিয়ে বললেন, এসো! এসো! এখানে শোও। চাকরি, সংসার, তার ওপরে আমাদের জন্যে ছুটোছুটি- কতো ঝামেলা কোচ্ছো! বিশ্রাম হোচ্ছে না মোটেও। শুয়ে থাকো কিছুক্ষণ।

- না, থাক্। আপনার অসুবিধা হবে। বিব্রত আপত্তি জানালাম।

- কিস্‌সু হবে না। এসো তুমি।

আমি শুলাম তাঁর পাশে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সংকুচিত বোধ করছি। বুঝতে পেরে বললেন, আরাম কোরে শোও। সরে এসো ব'লে কোলের কাছে টেনে নিলেন। বললেন- আমার যদি এমনি একটি মেয়ে থাকতো! সেই সঙ্গেই বলে উঠলেন- তাতে কি! তুমি আমার মেয়েই।

আগেই শুনেছিলাম তিনি বিয়ে করেননি। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কলকাতায় তাঁর কে আছেন! কাদের কাছে কিভাবে থাকেন!

www.pathagar.com

বললেন সব।

হঠাৎ করেই প্রশ্নটি করে বসলাম- আপনার নিঃসঙ্গ বোধ হয় না?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না, দিতে পারলেন না বুঝি।

ধীরে ধীরে বললেন- ঠিক বুঝি তা নয় মা! একজন আমার হৃদয় ভরিয়ে রেখেছে। তার স্মৃতিময় বাণী সুর আমার আজীবনের সঙ্গী। সে ‐‐বই ঘিরে রয়েছে আমার চারপাশ।

আমি কখন সোজা হয়ে শুয়েছি আর তিনি তাঁর ডান হাতখানা মেলে দিয়েছেন আমার গায়ের ওপরে। বললেন, মা-মেয়েতে কথা। তবু বলচি- এখন যদি সুস্থ থাকতেন, তবে বলতুম। প্রাচীরের মতো বুকখানায় মাথা ঠুকে ঠুকে বলতুম- একি করলে তুমি! আমার তো সব্বোনাশ করেচো তুমিই। তোমার জন্যেই তো জীবনকে আর ভিন্ন তারে বাঁধতে পারলুম না।...

আপন মনে বলতে লাগলেন- কোথাও গিয়ে টিকতে পারিনি। হায়দারাবাদের নিজামের দরবারে গানের আসর। দাওয়াত এলো। কী শান-শওকত! গান গাইলাম। গান শুনে নিজাম তাঁর আঙুল থেকে আংটি খুলে নজরানা পাঠালেন। যে ক'দিন ছিলাম, রাজরানীর মতো!

আবার চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। বলতে লাগলেন- অভিশাপ দেবো না। তাঁকে কি অভিশাপ দেওয়া যায়! তিনি কি অভিশাপ পাবার মতো মানুষ!

আঁচল তুলে চোখ মুছলেন। তাঁর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমিও কেমন আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি তিনি কাঁদছেন।

- ছুটে এসেছিলুম তাঁর কাছে। অত হৈ-চৈ করা মানুষ, হঠাৎ করে চুপ হয়ে যেতেন। বলতেন, তোমার কণ্ঠের তুলনা নেই আঙ্গুর! তারপর আবার স্বাভাবিক ঝরঝরে কণ্ঠে বলতেন- গান তুলে দিলাম, সুরের কেবল কাঠামোটা। এখন তোমার কণ্ঠের আঙ্গুর রস মিশিয়ে নাও। আমার নামটি ওঁর মতো ক'রে কেউ বুঝি উচ্চারণ করতো না। ওঁর মুখে এই নাম আনন্দের শিহরণ জাগাতো আমার বুকে। ওঁর সব কিছুই ছিলো প্রাণে ভরা। কী অপূর্ব প্রাণময়! আসলে ওঁতো মানুষ ছিলেন না- ওঁ ছিলেন দেবতা! যেমন চেহারা, আকাশের মতো উদার অন্তর! যেমন গান, তেমনি কথা সুর, হাসি উচ্ছ্বাস আবার অভিমান দুঃখ ভারাক্রান্ত- কত রূপে যে তাঁকে দেখেচি!

চুপ করে আছেন তিনি। ওপাশে ছোট বোন ইন্দুমতী দেবী, তাঁর ডাক নাম বিজু, মাথা একটু তুলে বললেন-

- বিজু ঘুমিয়ে পড়েচে বুঝি! যাক্ ভালোই হয়েচে। বললেন, বিজু ঘুমিয়ে, আমার চোখে সহজে ঘুম আসে না।

দু'জনেই চুপচাপ আমরা। ধীরে ধীরে বললাম, আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করবেন না তো!

www.pathagar.com

- না মা! কি এমন জিজ্ঞেস করবে! কিস্যু মনে করবো না। বলো তুমি।

- প্রমীলা দেবীর সঙ্গে আপনার কিরকম সম্পর্ক ছিল!

- খুবই ভালো। ভালো সম্পর্ক ছিলো। দেখা হলেই বাসায় যাবার জন্যে জোরাজুরি লাগিয়ে দিতো। বড্ড ভালো মেয়ে। ও যা করেচে, আমরা সবাই তার জন্যে ঋণী। কতোভাবে যে সে তাঁকে বাঁচিয়েছে। বড্ড যন্ত্রণা সয়েছে সে। ভগবান স্বর্গবাসী করেচেন- দুই হাত কপালে ঠেকালেন। বললেন, ছেলে দু'টো মানুষ হলে পুষিয়ে যেতো। ধীরে ধীরে প্রসঙ্গ ফেড্ আউট করলো যেন।

এর পর আরো ক'দিন ছিলেন। আমাদের বাসায় ছিলেন দু'দিন। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আর ওঠেনি। তাঁর সংগীত জগতে প্রবেশ, ছোটোবেলার কাহিনী, বাবা-মা, দাদু-দিদিমা, সংগীতে প্রতিষ্ঠা, এক্ষেত্রে সমসাময়িক শিল্পীদের ভেতরে ঈর্ষাকাতরতা, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের আচার অনুষ্ঠান, আজীবন সমাজের বৈরী আচরণ- এমনি নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলাপ করেছেন মন খুলে। আমি নিজের থেকে তুলিনি নজরুল প্রসঙ্গ। ভেবেছি, যথেষ্টই বলেছেন। মা-মেয়েতে এর বেশি আর কতখানি বলা যায়!

www.pathagar.com

যাঁর মুখে ছিল শুধু জীবনের গান | কবি আহসান হাবীব

দীর্ঘ একুশ বছর তাঁর সহকর্মী আমি। সামনাসামনি টেবিলে বসে কাজ করেছি একুশ বছর। এর অন্যথা হয়নি দীর্ঘ এই চাকরীজীবনে- যার শুরু ১৯৬৪ সাল থেকে আর অবসান ১৯৮৫তে।

১৯৬৪ সাল, পাকিস্তান আমল তখন। দৈনিক বাংলার নাম ছিল 'দৈনিক পাকিস্তান'। 'দৈনিক পাকিস্তান' প্রথম প্রকাশিত হয় পুরনো ঢাকার টিপু সুলতান রোডের অফিস থেকে। সেখান থেকে পত্রিকা অফিস চলে এলো মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ১ ডি, আই, টি এভিন্যুতে।

নতুন অফিস বিল্ডিং চার তলা। আমার আর আহসান হাবীবের বসার জায়গা হয়েছে দোতলার একটি কামরায়। দোতলা থেকে একদিন আবার স্থানান্তর করা হলো আমাদের তিনতলায় এবং তারপর চার তলায়।

লিফট-এ অথবা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান হাতে ঘুরে ডান দিকে প্রবেশ করে বাঁ হাতের প্রথম ঘরটিতে আমি আর আহসান হাবীব বসি, দুটি টেবিলে সামনা সামনি।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন তিনি। আলাপ-আলোচনা করতে ভালো বাসতেন। শিল্প সাহিত্য, দেশ, সমাজ, সংসার- সবই ছিল তাঁর আলোচনা সমালোচনার বিষয়। বলতে শুরু করলে অনর্গল বলতেন। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়তো তিনি কথা বলে যেতেন। কখনো নিজেই সচকিত হয়ে পোড়া সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে আবার জোরে টান দিতেন। ধোঁয়া ছুঁড়ে দিতেন শূণ্যে।

কখনো তাঁর কথার তোড়ে আমার কাজ ব্যাহত হতো বৈকি। হয়তো আমার ভাবভঙ্গি থেকেই বুঝে ফেলতেন। বুঝে বলতেন- আপনি কাজ করুন। আপনার ডিস্টার্ব করা হচ্ছে। তেমনি কোন প্রসঙ্গে হয়তো বলতেন- এ্যাতো এ্যানোম্যালিস আর অসঙ্গতি চার দিকে। জানি, বলে কোন লাভ নেই। তবু না বলে পারি না।

ছেলেরা আসে তাঁর কাছে। তরুণ লেখক তারা, এসে তাঁর সাক্ষাৎ পেলে সামনের চেয়ারগুলোয় বসে যায়। না থাকলে জিজ্ঞেস করে- হাবীব ভাই আসেননি? আসবেন না?

তাঁর ভেতরের তারুণ্যই আকর্ষণ করেছে ওদের। মাঝে মাঝে গুলজার করে আলোচনার আসর বসে। আর মনে হয়, ওদের তারুণ্যের উৎস যেন তিনিই। তাঁর মুখে মৃত্যুর কথা শুনিনি কোনদিন। শুনেছি কেবল জীবনের কথা। উত্তাল ঢেউয়ের বিপরীতে সাঁতরে সাঁতরে কিভাবে এগোতে হয়েছে সারাটা জীবন চোখে মুখে দীপ্তিমান আনন্দ নিয়ে

www.pathagar.com

তারই কাহিনী বলে গেছেন তিনি। তরুণরা শুনেছে। জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা হিসাব করেননি। সেসব যেন কোন প্রশ্নের বিষয় নয়, চলাটাই আসল।

কথায় কথায় একদিন বলছিলেন- তরুণ বয়সে মনে হতো, বুড়ো হবে অন্যেরা, আমি কেন! একদিন বললেন, ভাবতাম অন্যেরা মরবে, আমি না। মরে যাবো একথা মনে আনতে পারি না।

জীবনকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন বলেই হয়তো। কঠিন শ্রম ব্যয় আর সাধনা দিয়ে জীবনকে কুঁদে কুঁদে নির্মাণ করেছিলেন। সেই জীবনকে হারাতে চাননি।

মৃত্যুর দশ দিন আগে পর্যন্ত তাঁর সামনা সামনি বসেছি। তাঁর মুখ স্মরণ করে 'মৃত্যু' শব্দটি ব্যবহার করতে কষ্ট হয়। এ শব্দটি সম্বন্ধে তাঁর অনীহা ছিল।

তবু অফিসে আমাদের সেই কামরায় বসে আছেন তিনি, কথা বলছেন- স্থির চিত্র এটা এখন। এ চিত্রই সত্য হবে এখন। আর সব সত্য যাবে হারিয়ে। আর কোনদিন দেখা যাবে না তাঁকে তাঁর ওই চেয়ারটিতে বসে থাকতে। আর কোন দিন কোন কথাও বলবেন না। এ জগতের কোথাও আর সন্ধান মিলবে না তাঁর।

একুশ বছরের কথা, তাঁর সম্পর্কে একুশ বছরের অভিজ্ঞতা একটি দুটি কথায় বলা সম্ভব কি! এলোমেলো হয়ে আছে সব। কত রকম ভাবে দেখেছি তাঁকে। কতরকম ভাবে চেনা জানা!

www.pathagar.com

কথা ও চিত্র

আহসান হাবীব

দেখতে দেখতে একটি বছর চলে গেল। কারো কারো কপোলের অশ্রুবিন্দু হয়তো এখনো শুকায়নি। গৃহে তাঁর ব্যবহৃত আসবাব এখনো তেমনি আছে। অফিসে একটি কামরায় তাঁর শূন্য চেয়ার। মাঝে মাঝে ধুলো ঝেড়ে মুছে রাখে পিয়ন আবুল কালাম। দরোজার ওপরে নাম ফলক। যেন মধুহীন মৌচাক!

ছোট্ট একটি কামরায় ছোট্ট একটি টেবিলের সামনে বসে তিনি একটি রাজ্য পরিচালনা করতেন। সাহিত্যের রাজ্য। প্রচার করতেন সাহিত্যের শৃংখলা। গঠনমুখী তরুণ লেখক দল এসে বসতো তাঁর সামনে তাদের রচনা সম্ভার নিয়ে। তিনি হাত পেতে গ্রহণ করতেন তা। তাদেরকে শোনাতেন জীবনের কত ভাঙা গড়ার কাহিনী। এদেশের বিদেশের কত সাহিত্য-শিল্পকর্মীদের নির্মাণ কৌশল, শিল্পীদের জীবনের চড়াই উৎরাই পথের বিচিত্র ঘটনা, উথান পতন, পরীক্ষা নিরীক্ষা। নতুনরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতো। উদ্বেলিত হতো, উৎসাহিত হতো। অনুপ্রেরণার আশীর্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরতো।

তারা অনুভব করতো তাঁর হৃদয়ের স্পর্শ। বুঝতো কেন তিনি শোনান এসব কাহিনী। তারাও অংশগ্রহণ করতো নিজস্ব বক্তব্য নিয়ে। সে অধিকার ছিল তাদের। কোনকিছুতে দ্বিমত জানাবার অধিকারও দিয়েছিলেন তিনি তাদের। কিন্তু ধীরে ধীরে অদ্ভুতভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে তারা তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে। সম্মোহিত দৃষ্টি মেলে কেবল শুনেছে। দিনের পর দিন তারা এসেছে, বসেছে ভিড় করে, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনেছে তাঁর কথা। আর তিনি শান্ত কণ্ঠে একই স্বরগ্রামে বলে গেছেন।

চারপাশে তরুণদের ঔদ্ধত্য অনুভব করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সামনে এসে তারা কেমন শান্ত হয়েছে, তাও লক্ষ্য করেছেন। এমন নিপুণ কুশলী শাসন আর দেখিনি।

তারা তাঁর সামনে এসে বসে নানা রকম প্রশ্ন করতো। তিনি একটি একটি করে তাদের মনের প্রশ্নের সেই গিটগুলো খুলে দিতেন। উত্তেজিত হতেন না কখনো। তাদের প্রশ্নের সে জটিলতা সহজ থেকে সহজতর বিশ্লেষণে মেলে ধরতেন তাদের সামনে। এর জন্যে যে অপরিসীম ধৈর্যের প্রয়োজন, তা ছিল তাঁর। এবং সম্ভবত এদেশের সাহিত্য চরাচরে যে দু'চারজনের এই বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে তিনি প্রধান তাঁদের ভেতরে। তাই বুঝি তাঁর কাছে ভিড় জমতো অমন।

সামাজিক ক্রান্তিকালের ধীমান তারুণ্যের প্রতি অপরিসীম মমতাবোধ ছিল তাঁর। অনুভব করতেন ঔদ্ধত্যের অপরাধ তাদের একার নয়। করুণার পাত্র তারা। তাদের জন্যে

www.pathagar.com

অনেক মমতা প্রয়োজন। তাঁর একটি কবিতা-

যৌবনের ঐ একটি প্রতিনিধি দেখো।
আমি তাকে
প্রত্যহ ওখানে দেখি।
ঐ এক বৃত্তে তার দু পায়ের উদ্দাম দাপট
দেখি। আর দেখি তার উত্তোলিত দুহাতে কেমন
মত্ততা। সে বলে
ধাবমান যৌবনের প্রতিনিধি
আমি এক অগ্রগামী পথিক, আমাকে
পুরাতন নিমন্ত্রণে পারেনা ভোলাতে কেউ
পারে না ফেরাতে।
আমি তার কণ্ঠে শুনি শূন্যতার হাহাকার
আহা এই নিষ্পাপ যুবাকে
প্রেমের অমর বাণী শোনালো না কেউ কোনদিন
একান্ত আপনজন। তাই
শ্বাসরুদ্ধ যৌবনের যন্ত্রণার নগ্ন আর্তস্বর
তার কণ্ঠে বেজে ওঠে চকমিত দর্শনের মত।
আমি তাকে দেখি আর তার ক্রুদ্ধ ইচ্ছের আগুনে
কিছু লাবণ্যের আভা দেখতে চাই
বলতে চাই তাকে
শূন্যতাবোধের এই অস্থির চীৎকারে নেই দর্শন।
সঙ্গীতে যৌবনে জীবন গাঁথা।

নতুন আর পুরাতনের ভেতরে সমন্বয়ে মঙ্গল দিকটি নিয়ে তিনি খুব বেশী ভাবতেন। সে পুরাতন শিক্ষিত হোক, হোক অশিক্ষিত। শহরের হোক অথবা গ্রামের হোক। অভিজ্ঞতার মূল্য আছে। অনেক দেখার, দেখেশুনে জানার অনেক দাম। তিনি লিখেছেন-

তাহলে উপায়? এই অসহায় প্রশ্ন করে একটি যুবক
সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে, বৃদ্ধ বলে, আছে।
অবশ্য আমার নেই জ্ঞান কিম্বা এলেমের জোর
তবু এই সাদা চুল সাক্ষ্য দেয়, দেখেছি অনেক।
কি জানেন, আমি
আমরা যদি দু'পক্ষই পরস্পর এগিয়ে একদা
মাঝখানে যেখানে শূন্যতা
সুতরাং বিশুদ্ধতা বিদ্যমান
দু'পক্ষ সেখানে

www.pathagar.com

নতুন বসতি গড়ি অতীত ঝঞ্ঝাকে মনে রেখে তবে
হয়ত যা চাই তার সন্ধান পেলেও পেতে পারি।

তাঁর সম্পাদনার সঙ্গে একুশ বছরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার। এর আগেও ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনে তিনি যখন সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন, তখন দুটি বই অনুবাদ করেছিলাম। শিশুদের বই এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। আমার পান্ডুলিপি প্রস্তুত এবং অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে প্রশংসা শুনেছি তাঁর মুখে। মূল বইয়ের দু'খানাতেই লেখার অংশ ছিল পৃষ্ঠার মাঝখানে এবং দুপাশে ছিল ছবি। পান্ডুলিপিও সাজিয়ে প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম সেই ভাবেই। এটাই ছিল তাঁর এ্যাপ্রিসিয়েশনের বিষয়। প্রশংসা এবং অপ্রশংসার একটি সংযমী ধরন ছিল, যা তাঁর নিজস্ব। এটা পরবর্তীকালেও তাঁর সহকর্মী হয়ে লক্ষ্য করে এসেছি।

সম্পাদনায় তাঁর নিবিষ্ট মন, আন্তরিকতা, মূল্যায়নের রীতি খুব লক্ষ্য করতাম আমি। কোন লেখককেই কম মূল্য দিতেন না। কোন লেখার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো নিজের হাতে কাট ছাঁট করতেন না। কবিতার একটি শব্দ, প্রবন্ধের কোন বাক্য, গল্পের কোন এক্সপ্রেশন সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ বা অমনোনয়ন থাকলে তিনি নিজে হাতে কেটে দিতেন না বা পরিবর্তন করতেন না। রেখে দিতেন লেখকের জন্যে। বিষয়টি তুলে ধরতেন লেখকের সামনে। যদি কেউ তাঁকে কনভিনস্‌ড্‌ করাতে পারতেন, তিনি তা মেনে নিতেন। আর তা না হলে লেখকের নিজের হাত দিয়েই কারেকশন করিয়ে নিতেন। কখনো লেখা ফিরিয়েও দিতেন লেখককে, ভেবে দেখার জন্যে।

অপূর্ব এক শিক্ষকতার ভূমিকা প্রকাশ পায় যেন এর ভেতরে, যেমন করে প্রকৃতি শেখায় তার সন্তানদের। অনেক কাছে থেকে এগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে আমার।

তখনো ''দৈনিক পাকিস্তান'' এ কোন লেখা দেবার সাহস হয়নি। আহসান হাবীবের সম্পাদনা উত্তীর্ণ হয়ে কোন লেখা সেখানে প্রকাশ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আমি লেখা দেব, তারপর দেখে শুনে আমার সামনের চেয়ারে এসে বসে লেখা খানি ফেরত দেবেন সসম্মানে, বলবেন- এটা রাখুন, এর পরেরটা দেবেন। - ভাবতেই খারাপ লেগেছে। এমনি দ্বিধা সঙ্কোচে আর দেওয়াই হয়নি। অনেকবার ভেবেছি কারো কাছে প্রথম পাশ করিয়ে কিছুটা নিশ্চিত হয়ে তারপর তাঁকে দেব। কিন্তু কাকে দেই! তালিম হোসেন এসব সম্পর্কে খুব কড়া। বিশেষ করে স্বজন সম্পর্কে। প্রথমেই যদি বাতিল করে দেন, তাহলে আর এগোবার সাহসই থাকবে না।

এমনিভাবেই চলছিলো। একদিন আকস্মিকভাবে 'পাকিস্তানী খবর'-এ প্রকাশিত আমার একটি লেখা সম্পর্কে উল্লেখ করে বললেন, একটি লেখা পড়লাম। কেন যে আপনি আমাকে লেখা দেন না, বুঝি না!' আমার তখনকার অনুভূতি বোঝাতে পারবো না। তখনি মনে মনে ঠিক করলাম, এমন একটি লেখা দেব তাঁকে, যেন এমনি সপ্রশংসভাবে গ্রহণ করেন।

দিয়েছিলাম তাঁকে 'প্রকৃতি সংলগ্ন' নামের একটি গল্প। গল্পটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

www.pathagar.com

ছেপেছিলেন। পরে গল্পটি সম্পর্কে ওজনদার প্রশংসার কথাও বলেছিলেন। এবং একদিন আমাকে প্রায় অভিভূত করে দিয়ে উচ্চারণ করলেন- তাঁর প্রিয় গল্পগুলোর ভেতরে আমার 'চন্দন' অন্যতম।

পরপর বেশ কিছু গল্প ছাপা হলো তাঁর সাহিত্য বিভাগে। একটি গল্প, শিরোনাম 'স্খলিত নক্ষত্র'। লেখাটি হাতে নিয়েই বললেন, নামটি সম্পর্কে আমার একটু আপত্তি আছে।

এ্যাদ্দিন অনেকগুলো গল্প ছাপা হয়েছে তাঁর পাতায়। সে সুবাদে দু'কথা বলার সাহস জন্মেছে আমার। বললাম, আগে পড়ে দেখুন গল্পটি কেমন, নাম না হয় পরে পাল্টানো যাবে।

গল্পটি রেখে দিলেন তিনি তখনকার মত, ডান হাতের ড্রয়ারে। দু'এক সপ্তাহ পর একদিন অফিসে গিয়েছি, দেখি নিউজ প্রিন্টের প্যাডে একটি লেখা পড়ছেন বেশ মনোযোগ সহকারে। উল্লেখ করার বিষয় যে- তাঁর কাজে সহযোগিতার জন্যে নাসির আহমেদ অথবা নাসির আহমেদের মত কেউ ছিল না তখন। তিনি একাই করতেন সব কিছু। নাসির আহমেদ শেষের দিকে বছর পাঁচেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছে তাঁর সঙ্গে।

তাঁকে ওভাবে পড়তে দেখে ভালো করে লক্ষ্য করলাম- লেখাটি আমারই। যার শিরোনাম 'স্খলিত নক্ষত্র'।

বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ হাততালিতে চোখ তুললাম। তিনি শুধু বললেন- ঠিকই আছে। বলে রেখে দিলেন। এই গল্পের নাম অনুসারে একটি গল্পগ্রন্থের নাম দিয়েছি স্খলিত নক্ষত্র এবং বইটি উৎসর্গ করেছি তাঁকে।

লেখা সম্পর্কে অনেক উপদেশ অনেক পরামর্শ গ্রহণ করেছি তাঁর কাছ থেকে। তাঁর হাত দিয়ে যে লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোকে আমার সফল লেখা বলে নিশ্চিন্ত আমি। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো প্রকাশিত হলে বলতাম তাঁকে- লেখাটি কি আপনার চোখে পড়েছে। কখনো নিজেই তাঁকে দেখাতাম, পড়তে অনুরোধ করতাম। যেন তাঁর ছাড়পত্র পেলে আর ভাবনা নেই, দ্বিধা নেই।

মাঝে মাঝে নিজের সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষাও দিতে হয়েছে তাঁর কাছে। একবার একটি নিবন্ধ তাঁর হাতে দিলে বলেছিলেন- আক্রমণ আসতে পারে, তার জন্যে প্রস্তুত আছেন তো!

বলেছি- আছি।

খুশী হয়েছেন। ঠাট্টা করে বলেছেন- তালিম হোসেনের সুযোগ্য সহধর্মিনী বটে!

নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল - 'চাই সাহসী তর্জনী সংকেত'। তরুণ সমাজ এবং আমাদের বিদগ্ধ সমাজকে নিয়ে লেখা।

সত্যিই আক্রমণসূচক লেখা এলো বেশ ক'টি। পক্ষেও এসেছিলো। তিনি বাছাই করে ছেপেছিলেন তার থেকে এবং সব মিলিয়ে যে জবাবটি লিখেছিলাম, সেটাও ছেপেছিলেন।

কবি আহসান হাবীব সমগ্র মনে প্রাণে একজন শিল্পী। জীবনের মামুলি বাস্তব বিষয়গুলো থেকে যদি ছুটি পেতেন, দৈনন্দিন জীবনের কিছু স্থূল জিনিস থেকে যদি মুক্তি

www.pathagar.com

পেতেন তবে অনেক স্থূল বিষয়বস্তুর ওপরেও রংয়ের পোচ লাগিয়ে তাকে মোহনীয় সৃষ্টি করে তুলতে পরতেন। অত্যন্ত জীবনবাদী শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এটা। অত্যন্ত আশাবাদী কবি ছিলেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই পূর্ণ কেবল আশার বাণীতে। তিনি বলেছেন-

আসতে দাও হাওয়া
উঠুক ভরে বুক
রোদের আরশিতে
দেখতে দাও মুখ।
জানালা খুলে দাও
দরজা খুলে দাও
দেখতে দাও আজ
ভোরের বাগানের
সারাটা বুক জুড়ে
নতুন কারুকাজ।

তিনি লিখেছেন

নানান সুরে সারা নিখিলে সাজ সাজ!
সবার সুরে সুর মিলিয়ে যাদি আজ
জীবনে পেতে চাও উদার কারুকাজ
সুরের কারুকাজ...
বাজিয়ে করতাল হাওয়াতে সারাদিন
নিজের সুরটুকু হবে না দ্বিধাহীন
অটল করতলে সহজে তুলে নাও
প্রাণের পাখোয়াজ।

তিনি লিখেছেন-

নিজের বাগানে স্থির সতর্ক দু'হাতে
জোয়ারের বুক থেকে নেবো কিছু লাবণ্য এবং
যখন ভাটার টান.....
দীপ্তি যার ফুরিয়েছে ভাসাবো, তা বলে
আজন্ম-লালিত এই পুরাতন মসজিদের
আত্মা এই একান্ত 'মিম্বার'
জোয়ারে দেবনা ডুবতে এবং ভাটায়
ভেসে যেতে দেব না দেব না।

তাঁর কবিতার বইয়ের নামও 'আশায় বসতি'।

কবি আহসান হাবীব জীবনকে খুব ভালবাসতেন, ভালবাসতেন প্রকৃতিকে। জীবনকে গোছাতে চেয়েছিলেন, সাজাতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির রূপ দর্শনের জন্যে উদগ্র বাসনা

www.pathagar.com

ছিল তাঁর। তাঁর সময়ের প্রয়োজন ছিল তাই। প্রয়োজন ছিল স্বস্তির, আর্থিক সঙ্গতির। বলতেন- ইচ্ছে হলো, চলে গেলাম কোন্ এক অঞ্চলে, পাহাড় অথবা সমুদ্রে অথবা বন্য অঞ্চলে, অজ্ঞাতবাস করে এলাম কিছুদিন! রসদ সংগ্রহ করে এনে নিরিবিলি নিরুদ্বেগে বসে গেলাম লিখতে!...

আমাদের সমাজে কে ভাবে কার কথা! বিশেষ করে সমাজের, দেশের এই ক্রান্তিকালে আমরা আশা করতে পারি না কারো জন্যে শুভ ভাবনার সে পরিবেশ। এটা দুর্ভাগ্য আমাদের। এ দুর্ভাগ্যের আদৌ আর অবসান হবে কি না কে জানে।!হয়তো এর ভেতর দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। এগুলোকে অগ্রাহ্য করে অথবা মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে, পথ কেটে যেতে হবে সামনে, চেষ্টা করতে হবে লক্ষ্যে পৌঁছাবার। আমাদের পরবর্তীরা যেন এই উদাহরণ গ্রহণ করতে পারে। এবং নিজেদের তৈরী করে এই ভাবে। নিরঙ্কুশ সময় সুযোগ মেলানো দুরূহ।

খবরের কাগজের অফিস। অবাধ গতিবিধি সবার। বিশেষ করে ফিচার বিভাগগুলোয়। এর ভেতরে 'রোববারের সাহিত্য' বিভাগে আকর্ষণীয় টেবিলে আকর্ষণীয় মানুষটির সামনে বসার লোভ অনেকেরই ছিল। ভিড় হতো। এরই ফাঁকে ক্লান্ত দুপুরে বাইরে যখন কাঠ ফাটা রোদ, মানুষ জনের আনাগোনা কম, তখন নির্জন নিঃশব্দ অবকাশে তাঁর অবসন্ন মনের অনেক ভাবনা প্রকাশ পেতো। বলতেন, একটা জীবনে কিছু করা যায় না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতেই ফুরিয়ে যায় একটি জীবন। যদি আরেকটি জীবন পাওয়া যেত, এই সঙ্গে জুড়ে দিতাম। তারপর গুছিয়ে সুন্দর করে সাজানো যেতো। শুধু দাপাদাপিই সার হলো। কিছু ঠিক ঠিকানা হবার আগেই যেন ফুরিয়ে যায় খেলা। ঠিকই বলেছেন সেই বিশাল শিল্পী! জীবনের এর মত কঠিন সত্য সংজ্ঞা আর বুঝি হয় না!- ইট্স্ এ টেল টোল্ড বাই এ্যান ইডিয়ট, ফুল্ অব সাউন্ড এ্যান্ড ফিউরি, সিগনিফাইং নাথিং!

বলতেন, ফের যদি ছোট বেলায় ফিরে যেতে পারতাম, তবে শুরু থেকেই গুছিয়ে আনতাম। প্ল্যান করে এগোতাম। ছেলেদের বলি। ওদের দেখে ভয় পাই কখনো কখনো- কে জানে শেষে গিয়ে কি ভারাক্রান্ত মন বইতে হবে ওদের। এই যে চলছে, ফিরছে, ভাবছে- এইভাবেই হেসে খেলে দিন যাবে বুঝি! কোনকিছু সীরিয়াসলি নেয় না ওরা! এর জন্যে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হবে হয়তো।!যদি জীবনকে গড়ে তুলতে না পারে! কে জানে।... গায়ে পড়ে উপদেশ দিতেন। এইভাবে না, এইভাবে চলো। এই পথ নয়, এই পথ ধরো!...

কিন্তু পরে শঙ্কিত মুখে মমতার হাসি ফুটে উঠেছে। ভাবতেন হয়তো,- না, তা হয় না। এই বুঝি সংসারের নিয়ম। আমাদের পূর্ববর্তীরাও আমাদের পথ বাতলেছেন। কিন্তু আমরা কি শুনেছি সে সব!

শেষ দিকে এসে জীবনের সঙ্গে যুঝে যুঝে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। খুঁজছিলেন একটি শান্ত পরিবেশ, শান্তির আবাস একটি। সুষ্ঠু সমাজ, উজ্জ্বল সংসার, সফল দেশ- সব মিলিয়ে সম্পন্ন বাগানের যে স্বপ্ন ছিল তাঁর দু'চোখে, তা ম্লান হয়ে আসছিলো ধীরে

www.pathagar.com

ধীরে। তাঁর চোখের সামনে তখন ভেসে উঠেছে তাঁর নিজের ছায়া-ঘন শ্যাম গ্রামটি।

সংসার জীবনে প্রবেশ করার পর গ্রামে তাঁর আর যাওয়া হয়নি তেমন। এতে করে গ্রামের প্রতি এক রোমান্টিক নষ্টালজিক আকর্ষণ জেগে উঠেছিলো তাঁর মনে। গ্রামের সব অভাব- অসুবিধা- দৈন্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো তাঁর দৃষ্টিতে। ঘটনার বিবরণ আর রঙীন বর্ণনার ভেতর দিয়ে তাঁর গ্রাম শঙ্করপাশার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন তিনি আমার সামনেও। শঙ্করপাশা গ্রাম, সেখানে তাঁর বাল্যের স্নেহনীড়।

কৈশোর পার না হতেই ঘরছাড়া। শুরু হয়েছে কলকাতার মত মহানগরীতে কঠিন নাগরিক জীবন। ইট পাথর আর সিমেন্টের দেয়ালের সঙ্গে ঠোকর খেয়ে খেয়ে চালাতে হয়েছে জীবন। পেছনে পড়ে থেকেছে মধ্যরাতের যাত্রাগান, জারিগান, পুথি পড়ার আসর। পথের পাশে কেয়ার ঝাড়, বেতবন, মাঠের খোলা হাওয়া, গাছ-গাছালির সবুজ সুবাস আর মাথার ওপরে উদার আকাশ।

গৃহের দোচালা ঘর, মাটির মেঝে, দীর্ঘ বারান্দা, বৈঠকখানা, আঙিনা। আঙিনার এক পাশে চুলোর পাড়। ক্ষেতে মই দেবার সময় মাছ কুড়ানো। সে কত মাছ! সে যেন এক মাছ কুড়ানো খেলা! পুকুরে কচুরিপানা সরিয়ে পলই গুঁজে রেখে আসা। সেই পলই ভরা কই মাছ এনে ঢেলে দেওয়া আঙিনায় রন্ধনরতা মায়ের সামনে। কৃত্রিম ক্রোধে কী ঝাঁ করে উঠতেন মা!

চিংড়ি মাছ ভাজছেন মা, ওঁরা ভাই-বোনেরা চুলোর চারপাশে ঘিরে বসে। ভাজা মাছ ঠান্ডা হওয়ার অপেক্ষা করছেন। তারপর মুঠি ভরে মুখে পুরছেন। সে যে কী মজা! সোনার খাঁচার সেই দিনগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেল! দৃষ্টি মেলে সেই দিনগুলো যেন শূন্যে খুঁজতেন।

মা ছিলেন ভারী শান্ত। একহারা গড়ন মা'র। মোমবাতির মত দেহ মন মমতার উষ্ণতায় গলে গলে যেত। বড় ছেলে হাবীব বলতে অন্তর কী কাঁ করে উঠতো! কেননা, খুব ছোট বয়সে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। শঙ্কর পাশা থেকে সুদূর কলকাতায়। কত যত্নে, তেলে-কাজলে, দুধে-ভাতে, সোহাগে-চুমুতে তিল তিল করে মানুষ করে তুলছিলেন কিশোরী মা তাঁর অনভিজ্ঞ স্নেহে তাঁর স্বপ্নের ধন প্রথম সন্তানকে। তারপর একদিন যেন আচমকা সেই সন্তান হলো তাঁর বক্ষচ্যুত। জীবনের বাকী অংশ মায়ের দৃষ্টির বাইরে, তাঁর নাগালের বাইরে হারিয়ে গেল। মার সেই বেদনা ভারাক্রান্ত মুখখানা দেখতে পেতেন তিনি। বলতেন, মা আমার কোনদিন মুখ ফুটে কিছু চায়নি, কোন দাবী দাওয়া জানায়নি। মা আমার আজন্ম দুঃখী। গোপনে কত অশ্রুপাত করেছেন, কে জানে!

বাবার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলতেন- ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ, সন্তান গর্বে গর্বিত। বাবাকে ভয় করতেন খুব। ভয় করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। মাকে ভালবাসতেন প্রাণ ভরে।

শঙ্করপাশায় কেটেছে তাঁর বাল্য, পিরোজপুরে কৈশোর। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন পিরোজপুর স্কুল থেকে। পিরোজপুর স্কুল, স্কুলের শিক্ষক, সেখানকার বকুলগাছ, বকুলতলা, পুকুর পাড়, পথ-ঘাট, মাঠ- আনন্দ আর উল্লাসের ঘুড়ি হয়ে আকাশে

www.pathagar.com

উড়তো। আর শিশুর মত সেই ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হয়ে উঠতেন উন্মনা।

কিছুদিন ধরে শহরের ভিড় আর হৈ-চৈ-এ আক্রান্ত হয়ে এক ধরনের মনঃপীড়া অনুভব করছিলেন তিনি। কোন এক নির্জন দ্বীপের অধিবাসী হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো তাঁর মন। মনে মনে বসবাস শুরু করেছিলেন তাঁর ফেলে আসা ছোট বেলার সেই দ্বীপে। মাঝে মাঝে বলতেন- মনে হয়, বেড়ার ঘর, সামনে মস্ত উঠান, উঠান পেরিয়ে সুপারী বাগান, তারপর মাঠ- বেড়ার ঘরের ঝাঁপ তুলে দিলে দেখা যায় বহুদূর অবধি- সেখানে গিয়ে বাস করি।

তিনি এখন কোথায় বাস করছেন, আমরা জানিনা। তিনি শান্তিতে থাকুন, আজ শুধু এই প্রার্থনা।

www.pathagar.com

নির্বাসনের পর | কবি ফররুখ আহমদ

কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেশ হৈ চৈ হলো। রেডিও-র মাইক্রোফোনে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের বাণী সংগ্রহের তোড়জোড়, তাঁর দাফনের জমি নিয়ে ছুটোছুটি, দাফনে শরীক হওয়া, জানাজায় কে আগের সারিতে দাঁড়াবে- ইত্যাদি।

পরবর্তী পর্যায় শোকসভা। বিভিন্ন অভিজাত মঞ্চে শোক সভায় জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের বক্তৃতা, আলোচনা, শোক প্রস্তাব গ্রহণ।

এর পরের পর্যায়ে তাঁর কবিতা সংকলন। মৃত্যু পরবর্তী কবিতা সংকলন উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তৃতামালা এবং সংগীতের জলসা। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেউ তাঁর দুটি অসাধারণ উজ্জ্বল চোখের মাহাত্ম্য আলোচনা করলেন। কেউ বললেন তাঁর কাব্যের বলিষ্ঠ ভঙ্গি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে। কেউ তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব বিষয়ে সাহসী বক্তৃতা দিলেন। সবশেষে শিল্পীরা উঠে এলেন মঞ্চে। কবি ফররুখ আহমদের রচিত সংগীত পরিবেশিত হলো। দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু চোখ ফেটে পানি এলো-ধূপের মত পুড়ে শেষ হয়ে গেলেন এই কবি!

হয়তো এই রকমই হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি নজিরের অভাব নেই। অতি সাম্প্রতিককালে সাহিত্যিক শ্রেষ্ট সোলজেনেৎ সিন তাঁর দেশ থেকে নির্বাসিত। অথচ তাঁর দেশের ইতিহাসে গর্বের ধনের মত বিরাজ করবেন তিনি। সে সময় আসবে নিশ্চয়ই!

কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠান চলছে, কিন্তু তখনো তাঁর ঘরে তাঁর ছেলে মেয়ে স্ত্রীর জন্যে পুরোপুরি অন্ন সংস্থান ছিলনা। তার কিছুদিন আগে তাঁর বড় মেয়ে চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে। তবে মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে চাকরীতে পুনর্বহাল হয়েছিলেন তিনি। মেয়ের মৃত্যুর দিনে কবি পত্নী বিলাপ করে কাঁদছিলেন- চাকরীটা থাকলে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত কি মেয়ে আমার...

কবি ফররুখ আহমদ মারা গেছেন দুরবস্থাগ্রস্ত অবস্থায়। একথা ভোলা সহজ নয়। অত্যন্ত দরিদ্র এবং নির্বাসিত বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিলো তাঁর। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়লাভ এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর চাকরী হারালেন। তাঁর কি অপরাধ তা প্রমাণ না হওয়া সত্ত্বেও জাতির প্রতিভূ এই কবির চাকরী বাজেয়াপ্ত হলো। কিন্তু বিনা চাকরীতে কিভাবে তাঁর সংসার চলবে সে কথা কেউ ভেবে দেখেনি তখন।

অর্থের অভাবে তাঁর সব কটি ছেলে মেয়ের স্কুল কলেজ থেকে নাম কাটা গিয়েছিলো। ঘরে বসে ছিলো সবাই লেখাপড়া বাদ দিয়ে। বাড়ন্ত ছেলে মেয়েদের প্রয়োজন মত খাবার

www.pathagar.com

জোটানো সম্ভব হয়নি। তিনিও মারা গেছেন- ডাক্তারের রায় অনুযায়ী ম্যাল নিউট্রিশনে। জ্বরে ভুগে ভুগে প্লীহা বেড়েছিলো। পরে প্লীহা অকেজো শক্ত হয়ে গিয়েছিলো। রোগ যখন ধরা পড়লো, তখন জীবনী শক্তি নিঃশেষিত।

রেডিও পাকিস্তান-এ চাকরী করতেন তিনি। সেই সুবাদে বরাদ্দ হয়েছিলো তাঁর জন্যে সরকারী বাসস্থান। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ছোট মেয়ে পিতার লাশের ঘরের পেছনে এক ফালি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ডুকরে কেঁদে উঠলো। বাইরে সবুজ প্রকৃতির দিকে দেখিয়ে বলতে লাগলো- আব্বা সবুজ রং খুব পছন্দ করতেন। বলতেন, আমাদের বাড়ি হলে, কার্পেট, সোফার ঢাকনা, দরজা জানালার পর্দা-সব এমন সবুজ রংয়ের হবে।

ছোট মেয়ে হয়তো বাপের এই আশ্বাসে বিশ্বাস করেছিলো। কিন্তু তার কথাগুলো আমার কাছে মনে হয়েছিলো পরিহাসের মত। হয়তো শুকনো কচি শিশু মুখগুলোয় হাসি আর আশার আনন্দ ফোটাবার জন্যে রূপকথার গল্পের মত শুনিয়েছিলেন এসব। অন্তত তাঁর জীবদ্দশায় এরকম কোন সম্ভাবনার প্রশ্নই ছিলনা।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে অনেক সাংবাদিক, সংবাদ প্রতিবেদক এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর লাশের চারপাশে। নজরুল সঙ্গীত শিল্পী শবনম মুশতারী কান্নাজড়িত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে- এখন এলেন! কেন সময় মতো আসেননি কেউ! কোন খোঁজ খবর নেননি!

যাঁরা তাঁর গৃহে সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ নবাগত। কী বিস্ময় আর অবিশ্বাস ফুটে উঠেছিলো তাঁদের দুইচোখে। বেদনায় পাংশুটে হয়ে গিয়েছিলো অনেক মুখ। নিরাভরণ জীবন যাপন করতেন কবি ফররুখ আহমদ- একথা অনেকেই জানতেন। কিন্তু কতটা- তা সেদিন নিজ চোখে দেখে বিশ্বাস করলেন।

তাঁকে যতদূর দেখেছি, এ নিয়ে তাঁর নিজের কোন অভিযোগ ছিল বলে মনে হয়নি। অহং দিয়ে জীবনকে বশীভূত করেছিলেন তিনি। সবকিছুর ওপরে অহংকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সগৌরবে। সম্ভবত তাই কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁর কাছে দীনতা। আর ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রতিরোধ করেছিলেন কারো মামুলী কৃপা করুণা। এর জন্যে তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশও কম ঘটেনি।

তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে মুগ্ধ বিস্ময়ে মনে হয়- এত প্রেম, এত মাধুর্য, এত শিল্প- সৌন্দর্য, এত কাব্য, এত রোমান্টিকতা ছিল তাঁর মন জুড়ে! রোমান্টিকতার একটি ভান্ডার ছিল তাঁর হৃদয়। তা থেকে উঠে আসতো অপূর্ব চিত্ররূপ, রূপকল্প, উপমামন্ডিত শব্দ সম্ভার।

ইসলামী আদর্শের কবি বলে ফররুখ আহমদ চিহ্নিত। সমসাময়িক কালে স্বতন্ত্র এই ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন অনুসারী। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত যে, তিনি সেই ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। হয়তো সত্য সে কথা। কিন্তু সেখানেও তিনি পরিপূর্ণ শিল্পী, অত্যন্ত বিশ্বস্ত কবি। 'সিরাজাম মুনিরা'য় মুহাম্মদ মুস্তফা কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন-

www.pathagar.com

"পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে সে
জাগে শাহান শাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে
ওড়ে নীলাম্রে অনবরত"

'মন' শীর্ষক কবিতায় বলেছেন-

"মন মোর আসন্ন সন্ধ্যার তিমি মাছ
ডুব দিল রাত্রির সাগরে!"

অপূর্ব কল্পনা অপরূপ কারুকর্মময় উপমা। জীবনের যে লগ্নে তাঁকে দেখেছি, দেখে মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, তাঁর কাব্যে যে শিল্পরূপ প্রস্ফুটিত, জীবনেও কি তিনি তা ফোটাতে পারতেন না? জীবনকে কি সাজাতে পারতেন না তেমনি কাব্যময় করে!

তিনি লিখেছেন-

"ষোল পাঁপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির!
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণ সেহেলির বিমুগ্ধ স্বপনে,
নিভৃত ইঙ্গিত তার ডেকে নেয় পুষ্পিত গহনে,
অনেক সমুদ্রতীরে স্বপ্নময় হ'ল এ শিশির
তারার সোণালী ফুল ছিটে পড়ে রাত্রির অঙ্গনে।"

এত রোমান্টিক যে কবি, পরবর্তীকালে তাঁর ব্যবহারিক জীবনের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ কে বলতে পারে! কেননা, জানা যায়- প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন এক সৌম্য সুন্দর, বিলাসী, বেহিসাবী, বেপরোয়া যুবক।

কবি ফররুখ আহমদের অনেক কবিতাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে- 'কবির দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে সন্নিবদ্ধ। তাঁর দু'চোখের দৃষ্টি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁদেরও হয়তো মনে হয়েছে একথা।

"বন-চামেলির স্রোতে ভেসে যাই কোথায় সুদূরে
ভারাক্রান্ত তনু ছেড়ে মন আজ ফেরে ঘুরে ঘুরে-
দক্ষিণ বাতাসে
নিজেকে হারায়ে ফেলে ছুটে চলে ব্যাকুল আশ্বাসে।"

প্রকৃত পক্ষেই মন তাঁর ছুটে ছুটে ফিরতো হয়তো। সেই সঙ্গে দৃষ্টি-

ভেসে চলে মন, দূরে
ভেসে চলে সুরভি প্রশ্বাস,
.... জানি না কোথায়-

সেই সুদূর দৃষ্টি কি সেখানে সংস্থাপিত,

"যেখানে ধূলিতে কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট চুমি
পরীর দেশের স্বপ্ন সেহেলি জাগে গুলেবকাওলী!"

তাঁর বুকে ছিল দিগ্বিজয়ী আশ্রান্ত নাবিকের প্রচন্ড শক্তি। কবি যেন সেই শক্তিকে শুধু

www.pathagar.com

কাব্য সত্যরূপেই রূপায়িত করেননি তার আগে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তারই ফলশ্রুতি তাঁর বলিষ্ঠ ব্যতিক্রমোজ্জ্বল কাব্য সম্ভার। তাঁর হৃদয় রসে সিঞ্চিত এই লাইন গুলো-

"নিপুণ হাতের বলিষ্ঠ পেশী যদি পড়ে যায় ছিঁড়ে
তবে তুরন্ত বদলায়ে নাও হাত,
এক লহমার গাফলতে জেনো এই মৃত্যুর তীরে
ডোবাবে অতলে প্রবল ঝঞ্ঝাঘাত!"

ফররুখ আহমদ 'সিন্দাবাদ'-এ লিখেছেন-

"ডেকেছে আমাকে জিন্দিগী আর মওতের মাঝখানে
এবার সফর টানবে আমাকে কোন্ স্রোতে কেবা জানে।"

'বার দরিয়ায়' কবিতাটিতে কবি একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। শব্দের ভান্ডার থেকে জহুরীর মত বর্নোজ্জ্বল মজবুত শব্দ তুলে এনে কবিতার দেহে খচিত করেছেন, নির্মাণ করেছেন কবিতা। দ্যুতিতে স্তবক গুলো যেন ঝলমল করে ওঠে-

"সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী!
খুরের হল্কা, ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুল্কি জ্বলে।"

'ডাহুক', 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'ঝরোকায়' - কবিতা গুলোর সম্পর্কেও এই কথাগুলো বলা যায়। 'বন্দরে সন্ধ্যা'-

"গোধূলি তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
-অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এলো চাঁদ,
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক- চঞ্চল;
অন্ধকার ধনুহাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ।"

ফররুখ আহমদ একই সঙ্গে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তীব্র কাব্যিক সৌন্দর্য এবং মাধুর্যময়। মৃত্যুর পর 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে তাঁর প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত কবিতা সমন্বয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এর ভূমিকা লিখেছেন শ্রদ্ধেয় জনাব আবুল ফজল সাহেব। এতে তিনি বলেছেন, "সমসাময়িক কবিকুলের মধ্যে তিনি এতখানি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও একক ছিলেন যে, তাঁকে সহজে কাতারবন্দী করা যায় না।"

ফররুখ আহমদ যত আলোচিত হবেন- এই সত্য হবে আরো দৃঢ়।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার | অরুনা আসফ আলী

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের সভানেত্রী অরুণা আসফ আলীর নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে আসেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অর্জিত স্বাধিকার লাভের পরে পরেই। তাঁদের উদ্দেশ্য নৃশংসভাবে নির্যাতিত এবং পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি জাতিকে প্রত্যক্ষ করা এবং সেই দেশের ধ্বংসলীলা এবং হত্যাযজ্ঞ কবলিত দূর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করা। এ দেশের নির্যাতিতা মা-বোনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যাকে উপলব্ধি করা এবং তাঁদের সংগঠনের মাধ্যমে এর সমাধানে সহযোগিতাও এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তাঁরা প্রায় সবাই এ দেশে ঢাকায় এই প্রথম এসেছেন। দলের সদস্যরা একবাক্যে বলেছেন, 'আমরা এ দেশ, এ দেশের মানুষকে দেখে বিস্মিত হচ্ছি। ধ্বংসাবশেষের ওপর সৌন্দর্য সৃষ্টির এমন প্রয়াস নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না!'

অরুণা আসফ আলী এবং বাণী দাসগুপ্ত, রেণু চক্রবর্তী, অসীমা রেখী, বিমলা ফারুকী, আইভি খান, হামিদা হাবিবুল্লাহ সবার সঙ্গেই আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল আমার একটি নিভৃত পরিবেশে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা মেয়েদের পুনর্বাসন বলতে কি বোঝেন তাঁরা।

অরুণা আসফ আলী বললেন, 'নিজের পায়ে মেয়েদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া। নিজের ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া।'

'যুবকেরা এই সব মেয়েদের বিয়ে করতে চান। এটা কি খুব একটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার?' প্রশ্ন করেছিলাম আমি তাঁকে।

চট্ করে তিনি কোন উত্তর দিলেন না। একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'মেয়েদের পূনর্বাসন অর্থই এ নয় যে, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। আমিও শুনেছি যে এইসব মেয়েদের বিয়ে করার জন্যে বহু দরখাস্ত এসেছে যুবকদের তরফ থেকে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বিষন্ন কণ্ঠেই বললেন, 'পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে যেন কৌতুককর মনে হয়!' বললেন, 'আমি জানি না এর পেছনে তাঁদের কিছু অভিসন্ধি কিছু লোভ আছে কি না!'

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'অধিকাংশ মেয়েরই আত্মীয় স্বজন মা-বাপ রয়েছেন। প্রথমে তাঁদের মনের কমপ্লেক্স দূর করতে হবে। মনের গ্লানি দুর করে মেয়েদের গৃহে ফিরিয়ে নিতে হবে।' নিজের হাতে মুছে দিতে হবে অতীত।

www.pathagar.com

অত্যন্ত শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন তিনি। মাতৃ হৃদয়ের উদার মমতা মেশানো তাতে।

বলতে লাগলেন, 'আমার মনে হয়, অনেক মেয়ে রয়েছে, যারা নিজেদের প্রকাশ করতে চায় না। সুতরাং সে সব ক্ষেত্রে তাদের নিয়ে হৈ চৈ করা অন্যায় হবে। আর যারা বাইরে চলে এসেছে, তাদের জন্যে এক্ষুণি সাহায্যের প্রয়োজন।'

ওঁরা শুনেছেন, গ্রামাঞ্চলেই নির্যাতন চলেছে বেশী। তাই বললেন, 'গ্রামে গ্রামে ফিল্ড ওয়ার্কার পাঠাতে হবে। ভলানটারী অর্গানাইজার পাঠাতে হবে। তারা গিয়ে সবার সঙ্গে মিলে মিশে একটা মানবিকতার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। যে জায়গায় তাদের বাস সেখান থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করতে হবে তাদের। কেননা সেখানে বসবাস করতে তারা নিজেরাই হয়তো অপছন্দ করে। অর্থকরী শিক্ষাদান করে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিতে হবে।'

যে সব মেয়ে অবাঞ্ছিত সন্তান ধারণ করেছেন, সেই সন্তানদের সমাজে কি ভাবে স্থান হবে?- প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

এর জবাব দিলেন রেনু চক্রবর্তী। ১৯৬৯ সালে বেশ কিছুদিনের জন্যে তিনি কো-অপারেটিভ ও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বললেন, 'শিশু নিষ্পাপ। এ ব্যাপারে আপনাদের, আমাদের দৃষ্টিকে করতে হবে অনেক প্রসারিত। বিপ্লবের ফলে কি অভাবনীয়রূপে স্বাধীনতা এসেছে এদেশের। সেই একই বিপ্লবের ধারায় সমাজ মনের সংকীর্ণতাকেও দূর করতে হবে। মহিলা সমিতি, সংস্থা তথা দেশের মা বোনদের ওপরে রয়েছে এই বিরাট কর্তব্য এবং দায়িত্ব। সমাজের সর্বস্তরে উদার মানসিকতা ছড়িয়ে দিতে হবে।'

বাণী দাসগুপ্ত বললেন, 'আমরা যখন আমাদের মা-বোনদের সেই পৈশাচিকতার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারিনি, তার জন্যে আমরা সবাই অপরাধী। তাদের তো কোন অপরাধ নেই। সুতরাং এর অংশ আমাদের সবারই সমান ভাগ করে নিতে হবে।'

সবশেষে অরুণা আসফ আলী বললেন, 'এটা যে দেশের বা সমাজের একটা বিরাট সমস্যা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে তাকে অত্যন্ত নগ্ন রূপ না দিয়ে ভেতরে ভেতরে এর সমাধানের চেষ্টা করাই উচিত'।

ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে অরুণা আসফ আলী একটি অগ্নিময়ী নাম। তাঁর নাম তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত ঘটনাপঞ্জী কাহিনীর মত প্রচলিত আছে। ত্যাগের প্রতীক তিনি। তাঁর মুখমন্ডলের বলীরেখায় সেই ত্যাগ আর ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা আর মানবিকতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

আজীবন রাজনীতিতে রয়েছেন তিনি। যৌবনের প্রারম্ভেই ভালবেসে অসম বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু যৌবনের মধুলগ্নের অধিকাংশ দিন কাটাতে হয়েছে কারাবাসে, কখনো আন্ডারগ্রাউন্ডে আত্মগোপন করে।

সারাজীবনই তিনি বামপন্থী রাজনীতি করে এসেছেন। বামপন্থী আন্দোলন

www.pathagar.com

চালিয়েছেন। ইংরেজ সরকারের তিনি ছিলেন ত্রাস। ইংরেজ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্যে। তাঁর ঘর-বাড়ি গহনাপত্র টাকা পয়সা সব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তাঁর নিজের ব্যবহৃত গাড়িখানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

গান্ধীজীর ওয়ারেন্ট তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ওয়ারেন্ট তুলে নেওয়া হয়নি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি ব্যবধানপূর্ণ ধারণা পোষণ করে এসেছি।। কিন্তু আলাপের মাঝে তিনি ধীরে ধীরে যেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে এলেন। আমি এরই সুযোগ নিয়ে তাঁকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলাম, 'আপনার বিয়ের ব্যাপারে কি আপনিই উদ্যোগী ছিলেন?'

লাজনম্র একটি হাসি ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সারামুখে। বললেন, 'অবশ্যই- বাধাতো এসেছিলো আমার অভিভাবকের তরফ থেকে। সুতরাং.....

একটু হেসে বললেন, 'আমাদের বয়সের তফাৎ কিন্তু অনেক। আমার তখন আঠারো আর ওঁর চল্লিশ।'

'উনি নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিলেন দেখতে?'

'খুব সুন্দর ছিলেন।'

দুটি চোখ বুঁজে আবেগভরে বললেন কথাটি। কল্পনার চোখে যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন, এমনি ভাবে তাকিয়ে রইলেন। এক এক করে বলতে লাগলেন- 'পোশাকে পরিচ্ছদে, চাল-চলনে তিনি কেবল সুন্দরই ছিলেন না, অসাধারণ ছিলেন।'

আমার প্রশ্নের উত্তরে আরো বললেন '১৯২৮ সালে প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমাদের এলাহাবাদে একটি বাসায়- একটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। তার নয় মাস পরেই বিয়ে হলো। আর ১৯৩০ সালে আমাকে জেলে যেতে হলো।'

সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে স্বস্তির জীবন যাপন করেননি তাঁরা কখনো। বার বার কারারুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তবু হয়তো পরিপূর্ণ ছিল তাঁদের জীবন। বললেন স্বামী আমার শুধু আইনবিদই ছিলেন না- তিনি ছিলেন একজন কবিও।

প্রসঙ্গ পাল্টে পাল্টে দীর্ঘ সময় ব্যাপী আলাপ করলাম আমরা। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি বললেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র এ দেশের অভ্যন্তরেই রয়েছে।'

বললেন, 'আমরাও বামপন্থী রাজনীতি করে এসেছি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সরকার যা করবে শুধু তার বিরোধিতাই করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই সমালোচনা করবো- কিন্তু সে সমালোচনা হবে গঠনমূলক- যাতে দেশের সংহতি নষ্ট না হয়।'

অরুণা আসফ আলী লেনিন পুরস্কার বিজয়িনী। এই পুরস্কারটি একটি মেডেল এবং সেই সঙ্গে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। কিন্তু এর একটি পয়সাও তিনি নিজের জন্যে ব্যয় করেননি। দেশের বিভিন্ন সংস্থাগুলোতে গঠনমূলক কাজের জন্যে দান করেছেন।- একথাগুলো জানালেন রেণু চক্রবর্তী। তিনি বললেন, 'অরুণাদি শুধু দেন, নেন না কিছু-

www.pathagar.com

কখনোই না!'

অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাত্রা তাঁর। পরিধানে একটি সাদা মোটা থান গায়েও একটি মোটা লংক্লথের জামা। পায়ে একজোড়া স্যান্ডেল। সংগ্রামী জীবনের একটি প্রতিমূর্তি তিনি। ত্যাগের মাধুর্যে, জীবনের কর্মমুখরতায় তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ।

কথাবার্তা আমাদের শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। রেণু চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলছি তখন আমি- শ্রীমতী আলী ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ফটোগ্রাফার ছিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি শ্রীমতী আলীকে বসতে অনুরোধ করলেন- একটি ছবি নেবেন বলে। কিন্তু তিনি আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নিন- তুলুন।'

তাঁকে বসার জন্যে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই বসলেন না। বললেন, 'কিসসু অসুবিধা নেই- সব জায়গাতেই এত ফরম্যাল হতে হবে তার কি মানে আছে!'

ফটোগ্রাফার বাধ্য হলেন ঐ ভাবেই ছবিখানা নিতে।

www.pathagar.com

অন্য ঠিকানা

আবদুল
গণি হাজারী

বেশ কিছু দিন হলো যেন একই বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছি। একই ধরনের আনন্দ বেদনা, একই রঙের দুঃখ-সুখ, একই চেহারার হাসি কান্নায় দোল খাচ্ছি। পথ চলছি, সংসার-চাকরি করছি, উৎসব-অনুষ্ঠান গৃহে প্রবেশ করছি দল বেঁধে, শোক সভায় সমবেত হচ্ছি, শোক মিছিলে সামিল হচ্ছি। ইদানীং প্রায় একই ধরনের কথা-গল্প-কাহিনী সব সময় প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের জীবন ঘিরে।

সবার মুখে আজকাল অনেক কথার ভেতরে একটি কথা অত্যন্ত সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে- মানুষ গুলো যেন পাতার মত ঝরে ঝরে পড়ছে। কেউ বলেন,- আলগোছে কে যেন বাগান থেকে ফুল তুলছে একটি একটি করে।...

বলাবলি করি, শুনি আর মুখে একটি বিমর্ষ- ম্লান, ছায়া নিয়ে ঘোরাফেরা করি আমরা। অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তা ভারাক্রান্ত করে তোলে মন। রেডিও, টেলিভিশন সংবাদপত্র কখন যে কার দুঃসংবাদ ছড়িয়ে দেবে!

এমনি একটি পরিবেশের চাঁপে নিঃশেষিত হচ্ছি আমরা বেশ কিছুদিন থেকে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় এমন কোন এক জায়গায় যাব, ট্রেনে অথবা অন্য কোন যানবাহনে রওনা হবো, এক জায়গায় গিয়ে তা যাবে থেমে। আর এগোবে না। সেখান থেকে শুরু হবে গরুর গাড়ির পথ। ধুসর মাটির পথ দিয়ে, সবুজ মাঠের ভেতর দিয়ে সরু আইলের পথ ধরে গরুর গাড়ি চলবে। সামনে প্রসারিত বিপুল দিগন্ত। গাড়ি চলতে চলতে অবশেষে পৌঁছে দেবে একটি ঠিকানায়।

ভাবতেই সেই ঠিকানার মানুষ গুলোর মুখ চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপে ভরে যায় মন- আমি কি তাদের ভুলে ছিলাম?

আমার সাড়া পেয়ে তারা বেরিয়ে আসবে। আদর করে নিয়ে যাবে গৃহের অভ্যন্তরের কুশল জানতে চাইবে। পিঁড়িতে অথবা মাদুরে বসিয়ে খেতে দেবে। কাছে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করবে। পাখার চারদিকে লাল সালুর ঝালর অথবা কাপড়ের ওপরে শাড়ির পাড়ের নানা রঙের সূতো দিয়ে সেলাই করা কতরকম নকশা। সুঁই সূতো দিয়ে একটু একটু করে বুনেছে ফুল পাখি মাছ পাতা চাঁদ সূর্য।

ধীরে ধীরে বাতাস করবে। ফাঁকে ফাঁকে এটা ওটা তুলে দেবে পাতে।

www.pathagar.com

এবাড়ি ওবাড়ি থেকে দল বেঁধে দেখতে আসবে শহুরে মানুষটিকে। ওদের চাল চলন সব আলাদা কিন্তু কি সহজ কি সহজে ওরা চোখের দিকে মুখের দিকে তাকায় কী সরল প্রশ্নে জানতে চায় একথা সেকথা।

ওরা এখনো ঢেঁকিতে ধান ভানে। কলা গাছের ছাই দিয়ে কাপড় কাচে। বাড়ির উঠানে অথবা পুকুর ঘাটে বসে মাথার চুলে বিলি দেয় আর আয়েশী গল্প করে। সময়ের প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ নেই! মাঝে মাঝে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময় আন্দাজ করে। নকশী করে করে ঘরের দেয়াল, মেঝে, উঠান ল্যাপে। সাদা মাটির ওপরে লাল মাটির প্রলেপ, তার ওপরে নকশী কাটে। কত রকমের পিঠা, বানায়। নকশী কাঁথা সেলাই করে।

শহর থেকে যে মানুষটি গিয়ে ওদের মাঝখানে দাঁড়াবে, তাকে কি যন্ত্রতাড়িত মনে হবে ওদের কাছে। ওরা যখন তাকাবে তার দিকে, ওদের দৃষ্টিতে তেমনি একটি ধারণার ছাপ কি ফুঠে উঠবে! শহুরে মানুষটির মুখ কি যন্ত্রের কোন অংশের মত শক্তবোধ হবে ওদের কাছে!

দিনান্তে হয়তো একবার খায় সেখানকার অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু শহুরে মানুষ হয়তো দু'বেলা খেয়ে এবং প'রেও তার মুখে একটি যন্ত্রণার ছাপ লুকোতে পারে না। ডিপ্রেশন, টেনশন, প্রেসার, হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক এগুলোতে ঘেরাও হয়ে থাকে। এসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায় কিন্তু তা কি সম্ভব হয়! এগুলো সব মানসিক এবং হৃদজনিত ব্যাপার। যান্ত্রিক যুগের সৃষ্টি।

জনাব আবদুল গণি হাজারী এই সেদিন মৃত্যুর মিছিলে শামিল হলেন। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন অনেকদিন থেকে। তাঁর হৃৎপিন্ডের স্ফীতি ঘটেছিল। ডাক্তাররা তাঁকে খুব সাবধানে থাকতে বলেছিলেন। বলেছিলেন উদ্বেগ কমাতে।

আবদুল গণি হাজারীর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্টতা বহুদিনের। তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে ছিলেন। অবশ্যি তাঁকে দেখে কখনো মনে হয়নি যে, কোন টেনশন উদ্বেগে ভারাক্রান্ত হতেন তিনি। অথচ একবার নয়, দুবার নয়- তিনবার স্ট্রোক হয়েছিল তাঁর এবং শেষ স্ট্রোকে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। তিনি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখতেন। এই বিষয়টির ওপরে তাঁর ভাল পড়াশুনা ছিল। টেনশন রোধ সম্পর্কে তিনি আমাদের অনেক পরামর্শ দিতেন। অনেক অটো সাজেশনের কথা বলতেন। বলতেন- যে কাজগুলো করবেন, সেগুলো সব একই সঙ্গে চোখের সামনে রাখবেন না। একটি একটি করে ধরবেন, শেষ করবেন। টেবিলে এক সঙ্গে অনেক ফাইল রাখবেন না। যে ফাইলটির কাজ করবেন, শুধু সেটাই থাকবে। সেটা শেষ হয়ে গেলে অন্যটি। ....

রেডিওতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জেনে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। সুন্দর সুসজ্জিত নিজ বাসভবনে বাস করতেন তিনি। তাঁর ঘরে ছিল ছাদ পর্যন্ত উঁচু শেলফ ভরা বই। একপাশে একটি টেবিল চেয়ার। সেখানে বসে কাজ করতেন পড়তেন। স্ট্যান্ডিং

www.pathagar.com

টেবিল ল্যাম্পটি টেবিলের ওপরে ঝুলছে। মনে হচ্ছে যেন কাজ করতে করতে উঠে গেছেন। এই এক্ষুণি আবার এসে বসবেন। টেবিলের ওপরে একগাদা ফাইলের স্তূপ।

মনে পড়লো তাঁর সেই পরামর্শ। তিনি জানতেন সবই, কিন্তু জানলেই সেই অনুযায়ী চলা সম্ভব হয় কি! তাঁর বেলাতেও একথা সত্য হয়েছে। বন্ধু বান্ধব এবং স্বজনদের পরামর্শ দিলেও তিনি নিজে তা এড়াতে পারেননি। টেনশন তাঁর ভেতরেও উত্তাল হয়ে উঠতো। কিন্তু বাইরে তার ভাবাবেগ প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। আর ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে।

কিছুদিন হলো আমাদের চারপাশ জুড়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেন- এই তাঁরা ছিলেন, এই নেই। আলো ছায়ার খেলার মত। বিনা নোটিশে তাঁরা চলে যাচ্ছেন। ভোজবাজির মত দৃষ্টির সম্মুখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছেন। কী গতি তার যান্ত্রিক গতি যেন।

www.pathagar.com

অন্তরঙ্গে | আবদুল গণি হাজারী

সকাল বেলা। টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোন করেছেন তালিম হোসেনের এক সহকর্মী। তিনি বললেন, সকালের রেডিও নিউজ শুনেছেন?

- জি না! কেন?
- হাজারী এক্সপায়ার্ড!
- কে! অবিশ্বাসী কণ্ঠে প্রশ্ন আমার।
- আবদুল গণি হাজারী হার্টফেল করেছেন, রাতে। হার্ট এ্যাটাক।

তালিম হোসেন তখনো বিছানা ছাড়েননি। আগের দিন দেশ থেকে তাঁর মাতৃবিয়োগ সংবাদ এসেছে। খবরটি শুনতে পেয়ে উঠে বসলেন। রিসিভার রেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম- হাজারী সাহেব...

চুপ করে রইলেন। চোখ দু'টির দৃষ্টি খুব অস্বাভাবিক। স্বগোতোক্তির মত বললেন- যে যাবার সে যাবে একটি নিঃশ্বাস চাপলেন যেন। - তুমি যাও ওর ওখানে। হাসনাকে বলো আমার খবর।

আবদুল গণি হাজারী তাঁর অনেক পুরনো, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলকাতায় দু'জন একসঙ্গে একঘরে থেকেছেন, এক বিছানায় ঘুমিয়েছেন। হাজারী সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে এবং পরেও তাঁর সম্বন্ধে অনেকবার অনেক কথা শুনেছি তাঁর মুখে, নানা প্রসঙ্গে। তালিম হোসেন আগাগোড়াই কিছু বোহেমিয়ান ধরনের। হাজারীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি তালিম হোসেনের চরিত্রের এ দিকটা নিয়ে খুব জমিয়ে গল্প শোনাতেন। একটি ভালবাসা এবং বন্ধুসুলভ শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পেতো তাঁর সে বলার ভেতরে।

দর্শন শাস্ত্রের ছাত্র হাজারী। গভীর পড়াশুনাও ছিল তাঁর বিষয়টির ওপরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পাশ করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসেন। ঢাকার জীবনে দেখেছি তালিম হোসেন, কামরুল হাসান, সরদার জয়েনউদ্দীন এবং আবদুল গনি হাজারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। সরদার জয়েনউদ্দীন বিয়ে করেছেন তখন। অবিবাহিত কামরুল হাসান এবং হাজারী সাহেব। আমাদের বাসায় প্রায় দুইবেলার অতিথি তাঁরা। ভাবী বেগম জয়েনউদ্দীন আমার নতুন সংসার পরিচালনার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। দাওয়াত বললে ভুল হবে, বরং রান্না-বান্নার ঝুট-ঝামেলা থেকে রেহাই দেবার জন্যে তাঁরা প্রায়ই আমাদের খেতে বলতেন ওঁদের ওখানে। সেই সঙ্গে অন্য দুই কুমারও বাদ যেতেন না।

সে সময়ে কামরুল ভাইয়ের সহযোগিতার কথাও খুব মনে পড়ে। হারিস ব'লে

www.pathagar.com

একজন ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটার ছিল- শরীর চর্চা শেখাতো মুকুল ফৌজের ছেলেদের। তৎকালীন ব্যায়াম বীর কামরুল হাসান মুকুল ফৌজের অধিকর্তাদের একজন। হারিস মুকুল ফৌজের ছেলেমেয়েদের 'হারিস ভাই'। সেই হারিস ভাই আবার কামরুল হাসানের খুব ভক্ত ছিল। কামরুল হাসানের রান্না-বান্না থেকে শুরু করে তাঁর দেখাশোনার ভার নিয়েছিলো হারিস ভাই। আমার তখন পরীক্ষা। একে পরীক্ষা, তার ওপর রান্নার লোক নেই। কামরুল ভাইয়ের ব্যবস্থা অনুসারে হারিস বয়ে নিয়ে আসতো আমাদের দুইবেলার আহার।

হাজারী সাহেব অনেক দেরীতে বিয়ে করেছেন। তিনি বয়সে এঁদের তিনজনের ছোট হয়েও যেন একজন মুরুব্বীর ভূমিকায় ছিলেন। যথেষ্ট কম্পোজ চরিত্রের। বন্ধুদের জন্যে, ঘনিষ্ঠদের জন্যে একটি আন্তরিক কল্যাণ অনুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তিনি অনেক বড় থেকে অনেক ছোটখাটো ঘটনার ভেতর দিয়ে।

কলকাতায় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সাপ্তাহিক পত্রিকা, নাম- 'আলোড়ন'। নিজের চারপাশে সম্ভাবনাময় অনেক তরুণ লেখকদের লেখা ছাপিয়ে তিনি তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। তিনি তাঁদের আহবান জানিয়েছেন প্রতিশ্রুতিশীল সৃষ্টি ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে আসার।

তাঁর জীবনের ছোটোখাটো ঘটনার একটির কথা বলি- আত্মীয় স্বজনহীন একটি লোককে তিনি ঘরে তুলে এনেছিলেন একেবারে পথ থেকে। লোকটি ছিল আধ পাগল। এঁদেরই তখন দুরবস্থা। ছোট এক ঘরে ডাবলিং করে থাকেন চারজন। তার ভেতরেই সেই আধ পাগলা লোকটিকে নিয়ে এসে ঢোকালেন। সামান্য কিছু টাকা দিয়ে তাকে লাগিয়ে দিলেন 'হকার' বিজনেসে।

খুব মজা করতেন তাঁরা লোকটিকে নিয়ে। তাকে প্রথম দিন যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন- তোমার নাম কি? লোকটি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাঁটের সঙ্গে জবাব দিলো- ব্রিটিশ। বাবার নামটি মনে আছে? মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন কামরুল হাসান। এমনি রসিকতা করতে ওস্তাদ তিনি।

ব্রিটিশ যেন বেঁকে গেল। কোন জবাব দিলো না। আর না ঘাটিয়ে এরপর থেকে তাঁরা ওকে ব্রিটিশ বলেই ডাকতেন।

ব্রিটিশও অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড করতো থেকে থেকে। সকালবেলা, ওঁরা কেউ হয়তো ঘুম থেকে ওঠেননি। ব্রিটিশ চাকি বেলুন নিয়ে থ্যাবড়া থ্যাবড়া করে রুটি বেলে চলেছে একের পর এক। রুটি বেলার শব্দে হঠাৎ জেগে গিয়ে কামরুল ভাই বললেন- এই তালিম, হাজারী ওঠো। দ্যাখো, ব্রিটিশ সাহেব আমাদের ভালবেসে কি করছে সাত সকালে!

ব্রিটিশ হঠাৎ হাতের বেলুন ছেড়ে দিয়ে উষ্মার সঙ্গে ব'লে উঠলো- ভালোবাসা মানেটা কি? বলেই তড়াক্ করে উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সারাদিন তার আর দেখা নেই। এই গল্প শুনেছি হাজারী সাহেবের মুখে। এই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, কে জানে ভালবাসার ব্যাপার নিয়ে তার মনে কোন গভীর ক্ষত ছিল কিনা! কোন কমপ্লেক্স

www.pathagar.com

টমপ্রেক্স।

সারাদিন পর বেলাশেষে একসময় দেখা গেল, ওঁদের ঘরের আশপাশে ঘুরছে ব্রিটিশ। সারাদিন খাওয়া হয়নি। অবশেষে হাজারী সাহেবই সেধে ঘরে নিয়ে এলেন তাকে।

ব্রিটিশকে আমিও দেখেছি ঢাকায়। পরনে ঢিলা খাকি কাপড়ের হাফ প্যান্ট, গায়ে তেমনি ঢিলা কোর্ট, গলাবন্ধ। যার ফলে কোটের নীচের কাপড় দেখা যেত না। আর সবার ওপরে আকর্ষনীয় তার মাথার হ্যাটটি। ছোটো-খাটো মানুষ। গায়ের রং এককালে ফর্সাই ছিলো। পরে তামাটে হয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর হাজারী সাহেব যখন ঢাকায় চলে আসেন তখন ব্রিটিশকে ফেলে আসেননি। ঢাকায় এসে তাঁরা প্রথম ওঠেন র‍্যংকিন স্ট্রীটে এক সময়ের নামকরা ছাত্রনেতা জনাব আনোয়ার হোসেন ও রোকাইয়া আনোয়ারের বাড়িতে। এখানেও একটি ঘর নিয়ে থাকতে শুরু করলেন। পরে সবাই বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন। হাজারী সাহেব ১৯৫১ সালে যোগ দিলেন 'দৈনিক সংবাদ'- এ সহকারী জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে। এই সময়ে তিনি এর সাহিত্য বিভাগটিরও পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রথম সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা আবদুল গনি হাজারী এবং হাসান হাফিজুর রহমানের উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায়। হাসান হাফিজুর রহমান তখন তরুণ ছাত্র। এই সম্মেলনের নাম ছিল 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। এই নামকরণের জন্যেই সেই পাকিস্তান আমলে বিতর্কের ঝড়ও উঠেছিল।

হাজারী সাহেবের চার পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নানাভাবে তাঁর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। প্রখ্যাত কথাশিল্পী সরদার জয়েনউদ্দীনকে তিনিই লেখায় অনুপ্রাণিত করেন প্রথম। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদনায় ছিলেন তখন তালিম হোসেন। হাজারী সাহেব সরদার জয়েনউদ্দীনকে তালিম হোসেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন থেকেই সূত্রপাত তালিম হোসেন এবং জয়েনউদ্দীনের ঘনিষ্টতার।

পাকিস্তান হবার আগে থেকেই হাজারী সাহেব লিখতেন। পাকিস্তান আন্দোলন চলছে তখন প্রবলভাবে। মিছিল, সভা-বক্তৃতা ইত্যাদিতে সারা কলকাতা সরগরম। ভারত বিভক্ত হবে দুইভাগে। মুসলিমদের জন্যে স্বতন্ত্রভূমি পাকিস্তান কায়েমের স্বপ্ন অনেকের চোখে। তারই উত্তেজনায় তাঁরা উদ্দীপ্ত। হাজারী সাহেবও তখন কবিতা লিখছেন পাকিস্তান-এর ওপরে, কায়েদে আজম-এর ওপরে। এই কবিতাগুলোয় অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগও ছিল।

তখন তাঁদের কল্পনায় স্বপ্নে পাকিস্তান শব্দটি একটি আলাদা জোশ এনে দিয়েছিলো। কিন্তু পাকিস্তান লাভের পর সে কল্পনা আর স্বপ্ন বিড়ম্বিত হয়। আশাভঙ্গ হয় ধীরে ধীরে পাকিস্তানের রূপ দেখে। তাঁরা যে পাকিস্তানের কথা ভেবেছিলেন, যার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন তা যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এর থেকে।

www.pathagar.com

আবদুল গণি হাজারীর প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলো তেমন উচ্চমানের নয় শিল্পের দিক থেকে। কেবল আবেগ আর ছন্দের মিল রেখে লেখা। এই কবিতাগুলোতে অসার্থক ভাবে অনেক আরবী-ফার্সী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু, শব্দ বিন্যাস, আঙ্গিক বদলেছে। এবং নতুন আঙ্গিকে লেখা 'কতিপয় আমলার স্ত্রী'-ই সম্ভবতঃ তাঁকে প্রথম কবিখ্যাতি দিয়েছে। এর ওপরেই তিনি 'ইউনেস্কো' পুরস্কার লাভ করেন।

গ্রন্থ আকারে তাঁর তিনখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে- 'সামান্য ধন' তাঁর প্রথম কবিতার বই। এরপর 'সূর্যের সিঁড়ি' এবং 'জাগ্রত প্রদীপ'। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত 'কাল প্যাঁচার ডায়েরী' নামে নিয়মিত একটি কলাম লিখেছেন 'বকলম' এই ছদ্মনামে অধুনালুপ্ত দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এ। পরে এই লেখাগুলো নিয়ে ওই নামেই বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন 'বকলম' স্বয়ং। ভূমিকার শুরুতেই তিনি লিখেছেন- ''দুঃখ যন্ত্রনায় যাঁহাদের অন্তকরণ ভারী, শোনা যায়, কৌতুক করিয়া তাঁহারা পরিবেশকে হালকা করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই কৌতুকাচার কদাচিৎ ব্যঙ্গরসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।''

এক জায়গায় আছে... ''পুরাতন কাগজপত্র যতই আবার উল্টাইতেছি, ততই এই ভাবিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া যাইতেছি যে, স্বাধীন হইবার পর যে সব বিষয় লইয়া মস্করা করিবারও সাহস আমরা পাই না, তাহার চাইতেও গুরুতর বিষয় সম্পর্কে কালাচাঁদ যে ভাবে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছেন গর্দানের নিরাপত্তাহীন সেই যুগে- তাহা কি করিয়া সম্ভব হইল।'' -'কাল প্যাঁচার ডায়েরী' আসলেও তাঁর এক দুঃসাহসী উদ্যোগ।

ধীরে ধীরে সৃষ্টিশীল সাহিত্য থেকে তিনি যেন স'রে আসছিলেন। মাঝে মাঝে যে দু'একটি কবিতা লিখেছেন, তাতে তাঁর কাল-সচেতনতা, আন্তর্জাতিকতা-বোধ খুব স্পষ্ট। দায়িত্বপূর্ণ চাকরীর ভেতরে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে হয়েছে তাঁকে। অথচ যখন ফ্রি ছিলেন, কাজের চাপ ছিলনা, তখন শুধু লেখাই না, জীবনকে উপভোগ করারও পথ খুঁজতেন। ঢাকা শহরের একমাত্র ভাল ছবি প্রদর্শনের সিনেমা হল তখন 'ব্রিটানিয়া'। সুন্দর পরিবেশ- সামনে রেক্স্ রেস্টুর‍্যান্টের সবুজ লন। হঠাৎ হাজির হ'য়ে গেলেন বাসায় টিকেট নিয়ে। ছুটির দিন হ'লে, ম্যাটিনী, কাজের দিন হলে ইভনিং। অথবা আগের দিন জানালেন- কাল ভোরে তৈরী থাকি যেন আমরা। গাড়ি নিয়ে আসবেন। তারপর কোথাও আউটিং-এ বেরোনো হবে- ইত্যাদি।

তাঁদের বিয়ের ঠিক পরের কথা- যুগল যুগল দাওয়াত খাবার পালা তখন। শুরু হলো কামরুল ভাইয়ের বাড়ি থেকে। আমরা তিনজোড়া দম্পতি খেলাম একসঙ্গে সেখানে। ইয়া বড় বড় কই মাছ, খাসীর গোশ্তের রেজালা, গরুর গোশ্ত, খোশ্কা এবং খাবার পর রস পিঠা। নতুন বউ হাসনা ভাবীর এই পিঠা খুব পছন্দ - তাই।

www.pathagar.com

খাবার পর একঘরে সরদার জয়েনউদ্দীন, কামরুল ভাই, তালিম হোসেন এবং হাজারী- আরেক ঘরে আমরা তাঁদের বেগমরা। খাওয়া হয়েছে যেন একেবারে গলা অবধি। সবাই বিছানার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত কাত্।

এরপরে খাওয়াবার পালা আমাদের। আমি করেছিলাম পোলাওয়ের সঙ্গে মুরগীর রোষ্ট, গরুর গোশত ভুনা আর কপির স্যান্ডউইচ এবং কাবাব আর খাবার পরে লাস্সি সেমাই। রাজিয়া খান আমিন আর আমরা তখন এক পাড়াতেই থাকি। ঘন ঘন আসা-যাওয়া। রাজিয়া এবং আমিন সাহেবও এসেছিলেন আমাদের দাওয়াতে। খুব হৈ-চৈ ক'রে খাওয়া হলো। হাজারী এবং আমিন সাহেব বললেন, এ্যাতো ভালো রোস্ট কখনো খেয়েছেন কিনা মনে পড়ছেনা! খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিলেন কামরুল ভাই। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন- তোমাদের স্মরণশক্তির বারোটা বেজেছে। তাঁর নাকী কণ্ঠ আর বলার ভঙ্গিতে হো হো করে হেসে উঠলাম আমরা। কামরুল ভাই ভুনা গোশ্ত্ খেলেন খুব! তবে মুখ বুজে। আমার বাবুর্চি গিয়েছিলো ছুটিতে। সুতরাং সব রান্না আমিই করেছি, বলতেই- সবাই একেবারে থ্রি চিয়ার্স দিয়ে উঠলো। রাজিয়া খান বললেন, ভাগ্যিস বাবুর্চি নেই, না হলে এই রান্না খাওয়ার সুযোগ হতো না নিশ্চয়ই!

লাস্সি খেতে গিয়ে কামরুল ভাই আর হাজারী সাহেবের ভেতরে বাক-যুদ্ধ লেগে গেল। হাজারী বললেন- দুধ কদু। কামরুল ভাই বললেন- না, দুধ কদু হলে একটুখানি কচ্-কচ্ করতো! এটা অন্য কিছু। দেখছোনা কেমন মুচ্ মুচ্ করছে। দাঁত ফেলছেন আর কান খাড়া করছেন- ওই দ্যাখো! হাজারী বললেন, কিন্তু অন্য কিছুটা কি! -ইত্যাদি। সব মিলিয়ে যেন এক মজার কান্ড। পরে অবশ্যি ফায়সালা হলো।

এমনি ক'রে কেটে গেছে দিন। ধীরে ধীরে সময় টেনে নিয়ে গেছে আমাদের ব্যস্ত জীবনের দিকে। সংসার, পেশাগত অনেক দায়িত্ব। একদিন হাসনা ভাবীর সঙ্গে দেখা হলো এক অনুষ্ঠানে- হৈ হৈ করে বলতে লাগলেন, জানেন, দারুন ফীল করি, কিন্তু কিছুই হয়ে ওঠেনা। সবাই একদিন একসঙ্গে খাবো, মেয়েদের গান শুনবো একটু আয়েশ করে, তারও অবকাশ হয় না। ওঁর তো ব্যস্ততার অবধি নেই। আমারো সেই অবস্থা। সঙ্গে ছিল তাঁদের একমাত্র ছেলে। ওকে আদর করলাম। হাসনা বললেন, দোয়া করবেন ছেলেটাকে যেন ভালভাবে মানুষ করতে পারি!

আরো কিছু দিন পরে হাজারী সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো দৈনিক বাংলা অফিসে। একটি মিটিং-এ এসেছিলেন। মিটিং শেষে বারান্দায় কথা বলছিলেন একজনের সঙ্গে। আমি আমার কাজ শেষ করে নীচে নামছিলাম। দেখা হতেই এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন- কেমন আছেন আপনারা? তালিম? ..... চলুন নামিয়ে দিয়ে যাই।

সম্ভবত সেই শেষ আসা এবং শেষ দেখা আমাদের সঙ্গে। অনেকক্ষণ বসলেন। কথায় কথায় দুই পক্ষ থেকেই টেনশন প্রসঙ্গ এসে পড়লো। মনস্তত্ত্বের ছাত্র আবদুল গনি

www.pathagar.com

হাজারী। কি ভাবে টেনশন এড়াতে হয়, এ নিয়ে অনেক আলাপ করলেন। বললেন অটো সাজেশন তো আছেই! তাছাড়া অফিসেই হোক অথবা বাসায় হোক অনেক ফাইল বা কাজের জিনিস, সব একসঙ্গে রাখবেন না টেবিলে। রাখতে নেই। ওতে টেনশন বাড়ে। একটি ফাইলের কাজ শেষ করে তারপর অন্যটি আনবেন। টেবিল খালি রাখতে চেষ্টা করবেন।

হাজারীর মৃত্যু সংবাদ শুনে সকালে যখন তাঁর বাসায় গেলাম, ইতিমধ্যে বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এসে গেছেন। আরো আসছেন। লাশকে গোসল করানো হচ্ছে। বারান্দা থেকে ভেসে আসছে কোরআন তেলাওয়াতের সুর, আতর গোলাব আগর বাতির খোশবু। হাসনা ভাবী আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন ছেলেটিকে বুকের কাছে নিয়ে। তাঁর পাশে বসলাম। একপাশে হাজারীর টেবিল। স্টীলের তারের ফ্লেক্সিবল্ টেবিল ল্যাম্প তখনো ঝুঁকে আছে একটি ফাইলের ওপরে। সে রাতেও তিনি এই টেবিলে বসেই কাজ করেছেন। দেখলাম, টেবিলে একটি নয়, একসঙ্গে একগাদা ফাইল!

www.pathagar.com

জোয়ারী প্রাণ | হাসান হাফিজুর রহমান

পানের রঙে রঞ্জিত ঠোঁট, পান-মশল্লার সুবাসে সুবাসিত মুখ। তখন তাঁর বয়স কত আর! অত কম বয়সে পান খাওয়া যেন মানায় না। কিন্তু হাসানকে পান না খেলেই যেন মানাবেনা। চোখেমুখে কখনো সহজ মোলায়েম কখনো দুষ্টুমি হাসি। সামনা সামনি হতেই জিজ্ঞেস করবেন- কেমন আছেন ভাবী! প্রতিদিনই দেখা হয় হয়তো। কেননা একই অফিসে চাকরি করি। ১৯৬৪ সাল 'দৈনিক পাকিস্তান' (পরবর্তিকালে 'দৈনিক বাংলা') পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর সহকর্মী হিসেবে আমাদের ঘনিষ্টতা এবং তালিম হোসেনের সঙ্গে হাসানের সম্পর্ক ছোট ভাইয়ের, সেই সুবাদে আমি ভাবী। অবশ্যি এ সম্পর্ক শিল্পী সাহিত্যিকদের একক পারিবারিক।

'দৈনিক পাকিস্তান' প্রকাশিত হবার প্রথম পর্যায়ের কথা- শিল্পী সাহিত্যিকদের অনেকে এই পত্রিকা অফিসে এসে উল্লসিত মন্তব্য প্রকাশ করতেন। বিশিষ্ট একজন সাহিত্যিক একদিন এসে প্রথম দৃষ্টিতেই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন- বাঃ! চমৎকার পরিবেশ তো! এ যে একেবারে ক্রীম অব দ্য সোসাইটি এসে জমেছে হে...

দু'টো পাশাপাশি ঘর মিলিয়ে বসে এডিটোরিয়াল সেকশন। তাঁদের মধ্যে আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আহমেদ হুমায়ুন, সানাউল্লাহ নূরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, আফলাতুন এবং আমি। আরেক ধারে আমাদের চীফ এডিটর জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং ম্যানেজিং এডিটর আহসান আহমদ আশ্‌ক্।

টিপু সুলতান রোডে বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর অফিস উঠে এসেছে একনম্বর ডি আই টি এভিন্যুয়ে বর্তমানের এই ভবনটিতে। এখানে আসার অল্পদিন পরেই রাজনৈতিক উত্থান পতন এবং সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে অফিসের কার্যকলাপ এবং পদাধিকারে পরিবর্তন এসেছে। হাসান হাফিজুর রহমানকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিলো। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবকে তাঁর সম্পাদকের পদ থেকে অবসর দেওয়া হয়- ইত্যাদি। কিছুদিন বিদেশে রাষ্ট্রদূতাবাসে কাজে নিযুক্ত থাকার পর হাসান আবার দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী কোন পদে নিযুক্তি হয়নি তাঁর। এই অবকাশে সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্যে মরহুম সিকানদার আবু জাফর প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক সমকাল' পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং তখন তাঁর হাতে সমকাল বেশ কিছুদিন নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে তার পড়ন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়েছিলো। এবং আগের

www.pathagar.com

মানেরও পূনর্বাসন ঘটে। সেই সময়ে একদিন দুপুরবেলা দৈনিক বাংলা অফিস থেকে সমকাল অফিসে গিয়েছি আমার একটা লেখা দেবার জন্যে। অফিসে লোকজন তেমন নেই। সামনের ঘরে বসে হাসান তাঁর একজন সহকর্মীর সঙ্গে দাবা খেলে অবসর বিনোদন করছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই খেলা স্থগিত রেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। বললেন- কি মনে করে ভাবী!

প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের তর সইছিলো না। খেলার গতি অনুযায়ী না সওয়াই স্বাভাবিক হয়তো। তিনি তাড়া দিলেন। হাসান আগেই আমার দিকে একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়েছিলেন, এবার নিজের চেয়ারটি টেবিল থেকে পেছনে একটু হটিয়ে আনলেন। চেজ বোর্ডটিও একপাশে একটু ঠেলে রেখে বললেন- একটু পরে। ভাবী এসেছেন, কথা বলি।

আরেকদিন গিয়েছিলাম সন্ধ্যায়। খুব ভিড় তখন হাসানের ঘরে। টেবিলের চারপাশে তরুণ লেখক লেখিকা, প্রেসের লোকজন। হাসানও খুব ব্যস্ত। আমি আমার প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্পের বইখানা নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর জন্যে। হাতে নিয়ে ব্যস্ততার ভেতরেও পাতা উল্টাতে লাগলেন। উৎসর্গের অংশটি পড়ে দুষ্টুমি হাসি হেসে বললেন- একজন লোকের আপনি এত ভক্ত! সত্যি হিংসা হয়!...

হাসানের ঠাট্টার কতকগুলো ধরণ ঘনিষ্ট অনেকের কাছেই পরিচিত। অনেকেই তার থেকে বাদ যাননি এবং তাঁরা তা উপভোগ না করেও পারেননি। নিজের কথাই বলি- আমার একটি গল্প 'দৈনিক পাকিস্তান' এর সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির নাম 'চন্দন'। লেখাটি রোববারে প্রকাশিত হয়েছে, সোমবারে অফিসে গিয়েছি আমি। দোতলার বারান্দায় উঠে দেখি, হাসান আমাদের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের সঙ্গে কাগজটি দুহাতে মেলে ধরে দেওয়াল মুখো হয়ে পড়ছেন। কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও আমার দিকে মোটেই না তাকিয়ে যেন দেখেননি তেমনি ভাবে আপন মনে মন্তব্য করলেন- মাফরুহা চৌধুরী আগে হিন্দু আছিলো, আমাগো তালিম ভাইয়ের লগে বিয়া হইয়া মুসলমান হইছে!

মন্তব্য শেষ। ফিরে তাকাবারও প্রয়োজন নেই।

হঠাৎ একদিন হাসান হাফিজুর রহমানের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। চিঠি এনে দিলো একজন পিয়ন। খুলে দেখি ভেতরে একটি কবিতা- একজন মহিলার লেখা। চিঠিতে দু'চার কথা লেখার পর লিখেছেন- আপনার জন্যে পাঠালাম কবিতাটি যদি ছাপেন, চিরদিন আঁচলে বাঁধা হয়ে থাকবো!

নীচে লেখা- তালিম ভাইকে সশ্রদ্ধ সালাম। তার নীচে স্নেহধন্য হাসান হাফিজুর রহমান।

কবিতাটি পড়ে বুঝলাম, কবি হাসান হাফিজুর রহমান এতে একবার চোখও বোলাননি। হাসানের মনে আছে কিনা জানি না- 'দৈনিক পাকিস্তান' আমলের এক ঘটনা। টিপু সুলতান রোডে দুপুর বেলা। আমি সামনের ঘরে আমার টেবিলে পেজ মেকআপ করছি। পাশের ঘরে হাসান লিখছেন। অন্যান্যরা কেউ কেউ আসেননি, কেউ

www.pathagar.com

কেউ ছিলেন, কিন্তু তখন খেতে গেছেন। এমন সময় জুতোর হিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে একজন মহিলা ঘরে ঢুকে খন্ খন্ করে বলে উঠলেন- 'মিতশ্রী' কে এখানে? আমি তাকে দেখতে চাই!

মহিলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আকস্মিক আক্রমণাহত আমি একেবারে থ! কিন্তু কথাগুলো কানে পড়তেই উঠে এসেছিলেন হাসান। হাসান তাঁকে আসসালামু আলাইকুম জানিয়ে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন- কি ব্যাপার? কি হয়েছে? বললেন- বসুন না।

- কে মিতশ্রী! চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন মহিলা। তাকে আমার দরকার।

- ও! কিন্তু এখন তো উনি থাকেন না। সকালে পাবেন তাঁকে।

মহিলা সারা দেহে ঝাঁকুনি মেরে সঙ্গে সঙ্গে এ্যাবাউট টার্ণ করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকালেন- উঃ! ভাবীর জানটা আর ধড়ে ছিল না বুঝি। তাই না! কিন্তু দেখলেন তো! কি রকম বাঁচিয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে বললেন- কী সাংঘাতিক! পরিচয় পেলে ঠিক আক্রমণ করে বসতো!

ব্যাপারটির কারণ এবার বলি- আমি 'সদর অন্দর' কলামে স্কুল কলেজের শিক্ষিকাদের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে লিখেছিলাম। বিষয়বস্তু ছিল, তাঁদের শালীন পোশাক তাঁদের কিশোরী তরুণী ছাত্রীদের প্রভাবিত করবে। কিন্তু কিছু কিছু মহিলা শিক্ষিকা অত্যন্ত স্বল্পপরিচ্ছদ, গাঢ় প্রসাধন ব্যবহার করেন, যা খুব বেশী রকম দৃষ্টি কটু।... এই মহিলা কলেজের শিক্ষিকা হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের ফ্যাশনে একেবারে শীর্ষে যাচ্ছিলেন। সুতরাং বিষয়টি তাঁর গায়ে লেগেছে- ঠাকুর ঘরে কে? আমি কর্তা, কলা খাইনি!

আমার লেখাটি হাসানের হাতে পড়লে তিনি কিভাবে পিট পিট করে তাকাবেন পুরনো দিনের দিকে আর হাসবেন আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। আর দেখা হলে বলবেন- ভাবীর স্মরণশক্তি অসাধারণ।

হাসান হাফিজুর রহমানের বয়স পঞ্চাস এখন- অর্ধ শতাব্দী পূর্ণ হলো। তাঁর পঞ্চাশ বছর পূর্তিকে অভিনন্দন। এ প্রসঙ্গে আজ বলতে গিয়ে ফেলে আসা দিনগুলোর ছোট বড় আরো কত স্মৃতি মনে আসছে! আমাদের 'দৈনিক বাংলা' ঘিরে কত কথা কত ঘটনা! টিপু সুলতান রোডের 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিসে আমরা সবাই ছিলাম খুব কাছাকাছি। পরিধিতে স্থানটি ছিল অপেক্ষাকৃত অপরিসর। হয়তো সেটাই কারণ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প গুজব হৈ- হুল্লোড় হাসি তামাশা- জমজমাট সে পরিবেশ। চা, সেই সঙ্গে বিরিয়ানী থেকে শুরু করে ডালপুরী, সিঙ্গারা, সমুচা, কাবাব-তন্দুর শিক! সানাউল্লাহ নূরী হাসানের অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু। একেবারে তুই-তুকার সম্পর্ক। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ- রৌদ্র আর ঝড়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো দু'জনের ভেতর। ওই বয়সে এ ধরনের একেবারে ছেলেমানুষী বন্ধুত্ব খুব বিরল। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই দু'জনে হাতাহাতি লেগে গেল! আবার আমাদেরই কারো মধ্যস্থতায় সঙ্গে সঙ্গেই গলাগলি। যেন আপোষে সব ঘটে যেতো। আমরা হাসতাম। কাজের অসুবিধা হলে বিরক্তি প্রকাশ করতাম আবার

www.pathagar.com

উপভোগও করতাম।

হাসান বর্তমানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণ কাজ পরিচালনায় তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ এবং সম্পাদনার প্রকল্প প্রধানের দায়িত্ব তাঁর। শুনেছি কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। কিছুদিন হলো কঠিন রোগ ভোগও করছেন। একদিকে রুগ্নদেহ অন্যদিকে গুরুদায়িত্ব- হাসান হাফিজুর রহমানের মত একটি প্রাণোচ্ছল মানুষের পক্ষেই সম্ভব এই দুইয়ের মোকাবিলা। মাস দুয়েক আগে হাসানের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। অনেক দিন পর দেখা হলো। চেহারায় রুগ্নতার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু কথাবার্তা, ব্যবহার এমন, যেন, কি আর হয়েছে তার! মুখে হাসিটি লেগেই আছে, সেই সঙ্গে পানের রং। যতক্ষণ ছিলাম, অনবরত কথা বললেন। বারণ সত্ত্বেও কথা বললেন। অটুট থাক তাঁর এই জোয়ারী প্রাণ!

সঙ্গ প্রস

www.pathagar.com

দুঃসময়ে প্রস্থান | হাসান হাফিজুর রহমান

কিছুদিন আগে হাসান হাফিজুর রহমানের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লিখেছিলাম। সেটা ছিলো তাঁর জীবনের জয়োৎসবের উচ্ছ্বাস আনন্দ আর আলোকসজ্জার পটভূমিতে ঘনিষ্ঠ স্মৃতি রোমন্থন।

১৯৬৪ সালের 'দৈনিক পাকিস্তান, থেকে শুরু করে 'দৈনিক বাংলা'য় দীর্ঘদিন হাসান হাফিজুর রহমানের সহকর্মী ছিলাম। এই সময়ের কিছু স্মৃতি অনুধ্বনিত হয়েছে আমার লেখায়। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ, গণআন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতা উত্তরকালেও কিছুদিন আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি। ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন হাসান। কিন্তু ১৯৭৩ সালেই এই পদ ত্যাগ করে সরে যেতে হয় তাঁকে। এর পর হাসানের কর্মক্ষেত্র বদলে যায়। ১৯৭৪ সালে তিনি মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর নিযুক্ত হন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন ও মুদ্রণ প্রকল্পের পরিচালনার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত হন। এত বড় একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নেবার যোগ্যতা আন্তরিকতা এবং সততার প্রমাণ দিয়েছেন হাসান। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের ভেতরে আকণ্ঠ ডুবে থাকলেন। চিকিৎসার জন্যে দেশ ছেড়ে বহুদূরে স্থানান্তরিত হয়েও নিশ্চিন্তে ছিলেন না। মস্কো সেন্ট্রাল ক্লিনিক্যাল হসপিটালের বিছানায় বসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন প্রকল্পের সিনিয়র অফিসার জনাব আফসান চৌধুরীকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের ঠিক আগের দিন লিখেছেন... গাফলতি করো না। কতগুলি লোকের ভবিষ্যৎ। আমি এদিকে আটকা পড়ে আছি। তোমার ওপর ছাড়া ভরসা করার মত কেউ নেই। আল্লাহ মেহেরবান, নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।...

হাসান এখন ভিন্ন খেয়ায় ভিন্ন পারের যাত্রী।হাসান বেশ কিছু দিন ধরে রোগভোগ করছিলেন। জটিল কতগুলো ব্যাধি অকালে আক্রমণ করেছিলো তাঁকে। আমরা ভেবেছিলাম- অসুখ হয়েছে, চিকিৎসা চলছে ভালো হয়ে উঠবেন। পঞ্চাশ একান্ন বছর কি আর এমন। বিশেষ করে হাসানের মত তারুণ্যসুলভ প্রাণোজ্জ্বল মানুষের কাছে তাঁর মুখের হাসি তাঁর জীবনীশক্তির প্রাচুর্যের ভরসাই দিতো। তাঁর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপরেও আস্থা ছিলো আমাদের। মাঝে মাঝে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতেন, তারপর একটু সুস্থ বোধ করলেই আবার অফিসে আসতেন। অফিসের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম দেখতেন, পরিচালনা করতেন, মিটিংয়ে আলোচনায় বসতেন। সুতরাং বিশ্বাস করা সহজ নয় তাঁর নিঃশেষ হয়ে যাবার কথা। তাছাড়া হাসানকে মাঝে মাঝে টেলিফোনে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলেই বলতেন- এখন ভালো আছি। শুনেছি আলাপ-আলোচনার ভেতরে নিজের রোগ-ব্যাধির প্রসঙ্গ তাঁর কাছে বাঞ্ছিত ছিল না মোটেই। তাঁর মত একটি সজীব প্রাণ কিছুতেই অন্যের কাছে একটি রোগদীর্ণ দেহের পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হতে চাননি। তাঁর দেহে রোগের যে লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো, সেগুলো সবার সামনে প্রকাশ করতে সম্ভবত কুণ্ঠিত ছিলেন।

আরো ভালো চিকিৎসার জন্যে তাঁকে বিদেশে পাঠানো হলো। সেখান থেকে খবর আসছিলো- হ্যাঁ, তাঁর দেহে রক্তের অভাব পূর্ণ হতে চলেছে। তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছে- ওজন বাড়ছে। ফুসফুস ভালো কাজ দিচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করেছি সে সব কথা। হাসান বলেও গিয়েছিলেন অনেকের কাছে- দেশে ফিরে এসে বেশ কিছু গঠনমূলক কাজ করতে হবে।

হাসান হয়তো মৃত্যুর কথা একবারো ভাবেননি। তাঁর মত মানুষের কাছে তাই-ই স্বাভাবিক। তাঁর 'নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক' প্রাপ্তির দিন, জিজ্ঞেস করেছিলাম শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে। তাঁর চারিত্র্য সম্পর্কে একটি ধারণা ছিল বলেই কথাটা বললাম একটু ঘুরিয়ে- এই তো দিব্যি দেখাচ্ছে!

হাসান হেসে বললেন- হ্যাঁ, আগের থেকে অনেক ভালো।

আগে তিনি এর থেকে কতটা খারাপ ছিলেন সেটাও কারো কাছে প্রকাশ করেছেন কি না সন্দেহ! সে খবর হয়তো একমাত্র তাঁর চিকিৎসকরাই জানতেন।

সেদিন হাসানের পরিধানে ছিলো কালো স্যুট। দেখতে ভালোই লাগছিলো। তবে ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে। মুখের ভাবটা ফোলা ফোলা।

এর আগে একদিন তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে। আমি তালিম হোসেন, সানাউল্লাহ নূরী, মিসেস নূরী। হাসান অনেকবার বলেছেন, তালিম হোসেন এবং আমাকে তাঁর বাড়ি দেখতে যাবার জন্যে। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বাড়ি- আমরা যেখানে থাকি সেখান থেকে অনেক দূর। বলেছিলেন- নূরী মাঝে মাঝে আসে, তার সঙ্গে আসবেন।

গেলাম। কিছুতেই ছাড়তে চান না যেন। অথচ, শুনলাম এ অবস্থায় তাঁর বেশী কথা বলা ক্ষতিকর। আমরা ভেবেছিলাম দেখেই চলে আসবো। সে কথা তুলতেই বললেন- কথা বলতে কথা শুনতে ভালো লাগছে। অবশেষে আমরা বললাম- কথা বলি আমরা, হাসান বরং শুনে যান। কেননা ডাক্তার যা বলেছেন তা মেনে চলা উচিত।...

হাসান যেন হাসতে হাসতে দু'হাত দুলিয়ে চলে গেলেন। উচ্চারণ করে গেলেন- জীবন আমার/এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়। মৃত্যুকে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।- না হলে এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর মুখের হাসিতো মিলিয়ে যেত! তিনি ভুলে থাকতে পারতেন না, তাঁর রোগ যন্ত্রণার কথা!

হাসান কত বড় সাহিত্যিক সে কথা পন্ডিত ব্যক্তিরা আলোচনা করবেন। আমি কেবল বলতে চাই তিনি অনেক বড় জীবনশিল্পী। তাঁর অন্তরে দেশ এবং দেশের মানুষের

www.pathagar.com

সম্পর্কের রূপরেখা, তার বিশ্লেষণ ছিলো অত্যন্ত উচ্চ মানের। তাঁর বৈদগ্ধে মানবিক সম্পর্ক মানবিক মূল্যবোধের রিয়ালাইজেশন ছিল খুব গভীর। এতে কোন ফাঁক ছিলো না। অকপট চিন্তা এবং তাঁর মনের এই ঐশ্বর্য তাঁর লেখায় শুধু নয় ব্যক্তিগত আচার আচরণেও স্পষ্ট। আজকের আত্মকেন্দ্রিক যান্ত্রিক ভূঁইফোঁড় পরিবেশে ব্যতিক্রম একটি চরিত্র হাসান হাফিজুর রহমান।

শিল্প-সাহিত্য সমাজে এক অনভিপ্রেত এবং দৃষ্টিকটু চাপকে উত্তরণ করে যেন তার উর্ধ্বে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন হাসান। পরিস্থিতির রুক্ষতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই মনে হয় এই সময়ে হাসানের চলে যাওয়া যেন ঠিক হলো না। সমাজের জন্যে হয়ে গেল মস্ত ক্ষতি। হাসান বিদেশে যাবার আগে আশা প্রকাশ করেছিলেন- ফিরে এসে কিছু সাংগঠনিক কাজ করবেন। তার পরিকল্পনাও ছিলো নিশ্চয়ই মনে মনে। অথচ হাসান যেন এক দুঃসময়ে অকাল প্রয়াত হলেন।

www.pathagar.com

ব্যতিক্রমী শিল্পী সত্তা | কবি হাবিবুর রহমান

কবি হাবিবুর রহমানের মৃত্যুর পর যে ছবি কাগজে পত্রে ছাপা হয়েছে, সম্ভবত সেইটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে সাম্প্রতিক ছবি। কিন্তু আশ্চর্য, সে ছবির সেই মুখটিতে মৃত্যুর কোন ইঙ্গিত ছিলনা। মৃত্যুর কোন ছায়া সেখানে প্রতিফলিত হয়নি। যাঁরা তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন তাঁর অসুস্থ অবস্থায়, তারাও ফিরে এসে বলেছেন দেখলে মনে হয়না এমন কঠিন রোগে তিনি আক্রান্ত। কঠিন রোগ যন্ত্রনা ভোগ করছেন!

তাই তাঁর ছবি দেখে চমকে উঠতে হয়। চেষ্টা করে স্মরণ করতে হয়- তিনি হারিয়ে গেছেন। তাঁর কার্যালয়ে, তাঁর গৃহ ছত্রছায়ায়, ছায়াঘন নীড়ে, তাঁর আত্মজদের মধ্যে কোথাও তিনি নেই। তবু বিশ্বাস হয়না। মনে হয় আছেন। হঠাৎ কখনো কোন বিদগ্ধ জন সমাবেশ অথবা রাস্তার ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে তার দেখা পাওয়া যাবে। হঠাৎ করে বলে উঠবেন- এই যে, অনেক দিন পর দেখা হলো। আশ্চর্য এই শহরেই আছি আমরা, তবু যেন সবাই অজ্ঞাতবাস করছি। নিজের নিজের বৃত্তে ঘুরে মরছি। তা ভাল আছেন তো। কর্তা। ছেলে-মেয়েরা!

দীর্ঘদিন পর দেখা হলেও এমনভাবে কথা বলতেন- তাতে করে দীর্ঘদিনের শূন্যতা পূর্ণ হয়ে যেত। কতরকম খবর দিতেন কতরকম খবর নিতেন। আত্মীয়-স্বজনদের কথা জিজ্ঞেস করতেন, ছেলে-মেয়েরা কে কি করছে জিজ্ঞেস করতেন। তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত আন্তরিক পরামর্শ দিতেন, আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য শরীর ইত্যাদি সম্পর্কেও নানা কথা বলতেন। সবশেষে বলতেন শীগগিরই যাব আপনাদের ওখানে। ঠিকানা দিয়ে বলতেন, অবশ্যই আসবেন একদিন। কিন্তু আসা যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তিনিও আসতে পারনেনি হয়তো সময়াভাবে, অথবা অত্যন্ত ব্যস্ততার ফলে কিন্তু আন্তরিকতা ছিল পূরোপুরিই। তারজন্যে কিছু মনে করার অবকাশ কম ঘটেছে। আজকের এই ব্যস্ততা আর জীবিকার্জ্জনের টানাপোড়নের এই যুগে মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। নিজের নিজের চারপাশে শক্ত খোলস নির্মাণ করে আজকাল তার ভেতরেই তার বসবাস।

কবি হাবিবুর রহমান জীবনে সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন। শান্ত-স্নিগ্ধ এক গৃহ-পরিবেশ কামনা করেছিলেন, ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীকে রাখতে চেয়েছিলেন শান্তিতে সুখে। সবাইকে নিয়ে কূলে ভিড়বার তীব্র আকাঙ্খায় প্রতিকুল স্রোতের বিরুদ্ধে হয়তো এলোপাথাড়ি দাঁড় বাইতে হয়েছে তাঁকে। এর জন্যে হয়তো অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। নিজের পথ থেকে দূরে সরে আসতে হয়েছে। সুখের একটি পরিবেশ নির্মাণ করতে, জীবনের অনেক বড় ক্ষতি স্বীকার

www.pathagar.com

করতে হয়েছে কিনা কে জানে। হয়তো তাই কাব্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিবর্তে অর্থের জন্যে বিদেশী বুকলেট, প্যামফ্লেট, অনুবাদ করেছেন। সৃষ্টিধর্মী লেখার পরিবর্তে লিখেছেন প্রচার পত্র অথবা অন্যকিছু, অর্থকরী বিষয়।

কিন্তু আমাদের সমাজ তা চোখ মেলে দেখেনি। সমাজ তা দেখেনা। সমাজের দৃষ্টিশক্তি আজো তৈরী হয়নি। শিশু সাহিত্যে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। শিশুদের জন্যে তাঁর সৃজনমূলক রচনা শিশুদের মন মুগ্ধ করেছে। শিশুদের জন্যে যে ধরনের রচনাশৈলীর প্রয়োজন, যে আন্তরিকতার প্রয়োজন আমাদের সাহিত্য সমাজে তার অত্যন্ত অভাব। সেই কারণেই শিশুদের জন্যে উপযোগী সাহিত্যের প্রসার ঘটেনি। কেননা, শিশু সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে শিশু হয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কবি হাবিবুর রহমান তা পারতেন, সৃষ্টির সে নৈপুন্য সে হৃদয় ঐশ্বর্য তাঁর ছিল।

এছাড়া সনেট রচিয়তা হিসাবেও তিনি ছিলেন সার্থক এবং সফল। তাঁর রচনায় এসেছে প্রকৃতি, রোমান্টিকতা, জীবনের বাস্তবতা, মানবতাবাদ ইত্যাদি। এছাড়া ব্যক্তি জীবন, সমাজজীবনও সেখানে রূপলাভ করেছে। তাঁর অপভ্রংশ নামক কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন-

বাতায়নে পথ চাহি লিখিনাকো প্রেমের কবিতা
চাহিয়া দেখিনা আমি কোন নারী চলে হেলে দুলে
কাহার চুলের গন্ধ উল্লসিয়া ওঠে কূলে কূলে
আমি চেয়ে দেখি শুধু মানুষের জীবন সবিতা
কোথায় উদয় তার, কোন কূলে হয় অস্তমিত
প্রেমের পূজারী নহি, তবু আমি মানুষের কবি
হাতুড়ি শাবল আর তার সাথে নর প্রতিচ্ছবি
নয়নে ভাসিয়া ওঠে, তারে হেরি হইনা বিস্মিত
আমি তো দরদী নহি তবু দরদ বাজে হেরি
মানুষের হাতে নিতি মানুষের চরম লাঞ্ছনা
মানুষের ফরিয়াদ কাব্যের মোর জাগায় মূর্ছনা
কাঁদিতে জানিনা তবু, বারি ঝরে দুটি আঁখি ঘেরি
মনে হয় মরি নাই বাঁচিয়া রয়েছি সুনিশ্চিত
মরার কলংক নিয়ে বেঁচে থাকা জীবনের রীতি।

প্রকৃত পক্ষে এমনি ধরনের উপলব্ধি নিয়েই তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অনেক শোকসভা হয়েছিল। শোকসভার মানানসই বাঁধাগদ আমাদের সবারই জানা।

শোকসভার আন্তরিকতা সত্ত্বেও আমরা আমাদের বাঁধাগদ উত্তীর্ণ হতে পারিনা। তাই মৃত-জীবিত সবাইকে নিয়ে যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। কারো জন্যে নতুন কোন উত্তরণ সম্ভব হয়নি।

আজ তাঁকে ঘিরে অনেক কথা মনে পড়ছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা.

www.pathagar.com

অনেক পুরনো। সুদীর্ঘ কাল ধরে তাঁকে আমি জানি। দেশ বিভাগের আগে থেকেই তিনি আমার স্বামী তালিম হোসেনের বন্ধু।

ধীরে ধীরে সেই বন্ধুত্বের সেই ঘনিষ্ঠতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেছে। আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। অনেক পানি গড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বেশ কিছু উত্থান পতন ঘটেছে। এরই টানা পোড়নে মানুষ তার অনেক কাছের মানুষ থেকে ছিটকে দূরে সরে গেছে। ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ আন্তরিক সম্পর্কের বিপুল প্রবাহে কোথাও কোথাও ভাঁটা পড়েছে। কোথাও কোথাও সম্পর্কে বৈপরীত্য এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঠান্ডা মস্তিস্কে অস্বীকৃত হয়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাবে মনে মনে একটি কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে অনেকের। পারস্পারিক সহজ সরল সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু কবি হাবিবুর রহমানকে দেখেছি এর ব্যতিক্রম। পরিবর্তিত কোন অবস্থাই, যেন তাঁর আন্তরিক সেই সম্পর্কের মাঝে কোন কোন আড়াল সৃষ্টি করতে পারেনি। বহুদিন পর পর একবার দেখা হলেও পুরনো সম্পর্কের গভীরতা, আন্তরিকতার উষ্ণতা তেমনি অনুভব করেছি। তাঁর কথায় একটি স্নেহ, একটি মমতা হৃদ্যতা ঝরে ঝরে পড়তো। দীর্ঘদিন পরেও, দীর্ঘদিনের ছেদ জুড়ে দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে ঠিক আগের সেই সুরেই কথা বলতেন। ভঙ্গির উচ্ছলতাতেও যেন কমতি হতো না।

দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর যে নিরপেক্ষতা ছিল, শিল্পী হিসাবে তা তাঁকে মহত্বের ঐশ্বর্য দান করেছে। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অনেক বড়। তিনি ছিলেন একজন জীবনধর্মী, মানবতাবাদী শিল্পী। কিন্তু দেহে মনে দরিদ্র আমাদের এই সমাজে তাঁর সেই শিল্পী সত্ত্বা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের সুযোগ পেলনা।

www.pathagar.com

ঘরে ঘরে তাঁর প্রতিরূপ চাই | জিয়াউর রহমান

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর তাঁর কামরায় যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে একটি রঙচটা স্যুটকেস, দুটি সাফারী শার্ট, একটি প্যান্ট, একটি আধছেঁড়া গেঞ্জি, সানগ্লাস একটি, পুরনো অতি সাধারণ টু-ইন-ওয়ান, পুরনো একটি ব্রীফকেস, একটি সাদা গোল টুপি ও জায়নামাজ। আর তাঁর পরনে ছিল পাজামা পাঞ্জাবী।

একজন মানুষের চরিত্র নির্ণয় হয় তাঁর আচার আচরণে। দেশের একজন রাষ্ট্রনায়ককে যখন আমরা মানসপটে কল্পনা করি তখন তাঁর সঙ্গে জড়িত থাকে অনেক জড়োয়া এবং জরি। কিন্তু জিয়া যে তার থেকে কিছু স্বতন্ত্র তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ধীরে ধীরে, তাঁর ইন্তেকালের পর। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আমাদের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে ক্রমশ। সে সবই যেন কাহিনীর মত।

একটি খুব উন্নতমানের স্কুল। সেখানকার প্রধান শিক্ষক হঠাৎ একদিন খুব ভীত-শঙ্কিতভাবে টেলিফোনে কথা বলতে চাইলেন দেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে। দ্বিধা-সংকোচে জড়িত শিক্ষক জানালেন.... স্যার আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার ছেলে আমি জানতাম না.... না হ'লে...

- কেন, আপনাদের নিয়ম কি? প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

- আমাদের নিয়ম, কোন ছাত্র যদি পরীক্ষায় খারাপ করে তবে তাকে আর আমরা আমাদের স্কুলে রাখি না।

- একেও বের করে দিন।

টেলিফোনের ওপার থেকে শিক্ষক হতচকিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। প্রথমে হয়তো বিশ্বাস করতে পারেননি।

প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর পুরনো প্যান্ট অল্টার করে তাঁর ছেলেদের দিতেন।

একবার, জিয়ার দুই ছেলে নতুন তখন স্কুলে ভর্তি হয়েছে। নতুন সহপাঠিদের সঙ্গে বাসায় ফিরছে। কিছুদূর আসার পর একজন ছেলে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের বাসা কোথায়?

কিছুদূরে বাসা দেখিয়ে বললো ছেলেরা- ওই যে।

- ওটাতো প্রেসিডেন্টের বাড়ি- বললো ছেলেটি।

www.pathagar.com

- আমার আব্বা তো প্রেসিডেন্ট।

শোনা যায় জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হবার পর দিনাজপুরের ডিসি'র কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। তাতে একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখলেন। বর্ষীয়ান সেই ব্যক্তি বরাবরই বিভিন্ন সংঘ, সমিতি, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। কোনটির সম্পাদক, কোনটির সভাপতি, কোনটির পৃষ্ঠপোষক- উপদেষ্টা ইত্যাদি। জিয়াউর রহমান তাঁর নাম উল্লেখ করে লিখলেন। তাঁকে বলে দেবেন, তিনি যেন সবকিছু ছেড়ে দেন। এখন থেকে শুধু সাংসারিক কাজ এবং সংসার চালাবার জন্য যা কাজ কর্ম তাই যেন করেন।

উল্লেখিত ব্যক্তিটি জিয়াউর রহমানের শ্বশুর।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আত্মীয়-স্বজন কারা, আমরা তা টের পাইনি। কিন্তু তিনি তো এই দেশেরই ছেলে। তাঁর ভাই-বোন মামা-চাচা ভাগ্নে ভাতিজা কারা আমরা আগে জানিনি। প্রেসিডেন্ট হবার পর তিনি কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করেননি। এড়িয়ে গেছেন। আত্মীয় স্বজনরাও তাঁর এই মনোভঙ্গির মূল্য দিয়েছে। কেউ কোন্ আলাদা সুবিধা ভোগের আশাও করতে সাহস পায়নি তাঁর আচরণে।

শোনা যায়, বেগম জিয়াকে তাঁর প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বাপের বাড়িতে যেতে দেননি। আত্মীয়-স্বজনরা এসে দেখে গেছেন তাঁকে।

একদিন দেশ থেকে জিয়ার এক নিকট আত্মীয় এসেছিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর আগমন বার্তা জানলেন সারাদিন পর বেশ রাতে ঘরে ফিরে। সাধারণ এবং স্বল্পাহারী জিয়া। রাতের খাওয়া শেষ হবার মুহূর্তে বেগম জিয়া- 'দৈ আছে'- বলে বগুড়ার বিখ্যাত দৈ-এর একটি সরা তাঁর সামনে এগিয়ে দিলেন। প্রেসিডেন্ট সেদিকে তাকিয়ে একটু থেমে গম্ভীর মুখে বললেন- 'তা এ দৈ কথা বলবে কখন?'

আমরা জানি এবং এদেশের দলমত নির্বিশেষে সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন, জিয়ার সততার কথা। নিজের বিবেকের প্রতি সততা, নিজের দেশ ও মানুষের প্রতি সততা।

ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধা কেন সহ্য করতে পারলেন না জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর! দেশের গ্রাম-গঞ্জের নারী পুরুষ-শিশু সবাই তাঁর জন্যে উচ্চস্বরে কেঁদেছে। শোকাচ্ছন্ন তারা। সবাই যেন হারিয়েছে তাদের একান্ত আপন কাউকে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর নেতা মেজর জিয়া পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর কবল থেকে কর্ণফুলি নদীর ওপর কালুরঘাট সেতু রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সেই সময় তিনি বৃদ্ধা জরিনা খাতুনের বাসায় কয়েকবার আশ্রয় নিয়েছিলেন, খাওয়া দাওয়া করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট হবার পর জিয়া সেকথা ভোলেননি। মোটর যোগে যাওয়ার পথে তিনি জরিনা খাতুনের বাসার কাছে থামতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। বছর খানেক আগে

www.pathagar.com

জরিনা খাতুনের ঘরের চাল দিয়ে পানি পড়ার খবর জানতে পেরে চাল মেরামতের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তের এমনি ছোট খাটো বহু খবর রয়েছে, যা গোপন ছিল এতদিন, মৃত্যুর পর জানা যাচ্ছে। দেখা গেছে মফঃস্বল শহর ও গ্রাম-গঞ্জের বহু স্কুল-কলেজ, সমিতি, সংস্থা, সংগঠনকে বা স্বেচ্ছা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে তিনি প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ দান করেছেন- স্বয়ং প্রেসিডেন্টের হাত থেকে প্রত্যক্ষ অনুদানের কথা যারা ভাবতেও পারে না।

গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি অদ্ভুত এক আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। আমরা টেলিভিশনে দেখেছি, তাদের সঙ্গে তিনি হেঁটে চলেছেন মাঠ-ঘাট পার হয়ে গাঁয়ের আইলের পথ ভেঙে। গাঁয়ের মানুষের একটি নিশ্চিত ধারণা, প্রেসিডেন্ট তো আরেক জগতের মানুষ। আলাদা সে রাজ্য! সেখানকার রাজা তিনি। মাটি থেকে সে স্থান অনেক উঁচুতে। আর তাঁর অবস্থানের পরিধি জুড়ে নিষেধের বেড়া। কিন্তু তারা বিস্মিত চোখে দেখেছে এই প্রেসিডেন্ট সব বেড়ার বাঁধ ছিঁড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের সামনে, তাদের মাঝখানে। নিজের হাতে কোদাল ধরেছেন, তাদের সংগে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসেছেন। তাদের সঙ্গে মাটির সানকিতে খেয়েছেন। তাদের অভাব অভিযোগ, সুখ দুখের বিষয় নিয়ে আলাপ করেছেন। তাদের সুখ-দুঃখের, অন্ন-বস্ত্রের বাসস্থান-স্বাস্থ্যের অবস্থার কথা অন্তরঙ্গভাবে শুনেছেন। উপদেশ দিয়েছেন, যথাসম্ভব সাহায্যের ব্যবস্থাও করেছেন। অনাবাদী জমিতে আবাদ করার ডাক দিয়েছেন। তার জন্যে খাল কেটে পানির ব্যবস্থা করতে তাদের কোদাল চালিয়েছেন। তাদের সঙ্গে আয়ের পথ, উন্নতির পথ বাতলেছেন। তারা অনুভব করেছে জিয়া তাদেরই ঘরের ছেলে, তাদের আপনার জন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের খুব সাধারণ মানুষেরও আপন। তাদের সব অভাব-অভিযোগের কথা তাঁর কাছে খুলে বলা যায়। সরাসরি তাঁর মনকে স্পর্শ করা যায়।

জিয়া গাঁয়ে গিয়ে সভা করে উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে গ্রামের লোকদের বুঝিয়েছেন, তাদের দেশের জলবায়ু মাটির সরসতা তাদের ফসল ফলানোর পক্ষে খুব উপযোগী। বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাছে হাত পাততে হয় তাদের খাদ্যের জন্যে। কিন্তু এ অবস্থা থাকবে না। ভবিষ্যতে এদেশের অবস্থা বদলে যাবে। তারা যেন কাজ করে এবং দরিদ্র বলে তাদের নিজেদের মন থেকে হীনমন্যতা দূর করে ফেলে। বলেছেন, বাংলাদেশে যে সব অনাবাদী জমি পড়ে আছে, সেগুলোতে যদি পরিশ্রম করে পানি সেচে ফসল উৎপাদন করা যায় তবে তাতে বছরে কয়েকবার কয়েক রকমের ফসল হতে পারে। এতে করে দেশের খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে সে ফসলের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতে পারে এবং তার ফলে একদিন তাদের আর অন্যের কাছে সাহায্যের হাত পাততে হবে না।

মাঝে মাঝে দেখা গেছে, তিনি গাঁয়ের মানুষের ছোটখাটো অভাব-অভিযোগের কথা

www.pathagar.com

মন দিয়ে শুনছেন। সব শুনে বলেছেন- আমি এবার উঠি। আপনাদের যে ভাবে কাজ করার কথা বললাম, সেই ভাবে কাজ করে যান সব ঠিক হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আমি আবার আসবো।

একজন শিল্পী তার শিল্পের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি যায়, আবেদন সৃষ্টি ক'রে মানুষের অন্তরকে উদ্বেলিত করে অভিভূত করে, তেমনি একটি অনুপ্রবেশের ক্ষমতা, মানুষের অন্তরকে জয় করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর সেই অনুপ্রবেশের ধরণটি ছিল এমনি- হয়তো গাঁয়ের কোন গৃহস্থের সঙ্গে আলাপ করতে করতে তার বাড়িতে গেছেন- বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে বলছেন- কই আপনার হাঁস মুরগী কই! আপনার এত বড় উঠান, এত জায়গা চারপাশে- দেখি আপনার ঘরে মেহমানের জন্যে কতগুলো ডিম আছে!... গাছ গাছালি লাগান নাই ক্যান। কলা, পেঁপে, আনারস... আমি যে আপনার মেহমান হয়ে আসলাম, আমাকে এখন কি খেতে দেবেন!

গৃহস্থের অন্তর স্পর্শ করেছে কথা গুলো। নুয়ে এসেছে তার দেহ মন একটি দরদভরা অন্তরের কাছে। এরপর সে গৃহস্থ তাঁর ইচ্ছা পালন না করে পারে কি! এবং সে কথাগুলো কে বলছে! বলছে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। তাদের কাছে বলতে গেলে দেশের রাজা– সর্বাধিনায়ক! তিনি নেমে এসেছেন মাটির ধুলায় কাদায়। তাদের দরিদ্র কুটিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তাদের কাঁধে সহায়তার হাত রেখেছেন। দুপুরের কড়া রোদে, ঝড়ো হাওয়ায়, বৃষ্টিতে গাঁয়ের যে সব পথে ঘাটে গাঁয়ের লোকদেরও চলতে কষ্ট হয় সেই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে তিনি দরিদ্র কৃষকদের দুয়ারে এসে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, নজীরবিহীন এ ঘটনা! তাদের কাছে অভাবনীয় অভিভূতকারী।

পাবনার জোনাব আলী ঝর ঝর করে বলতে লাগলো- আমরা আর কিভাবে কাজ করবো! আমাদের হাত পা ভাংগা দিয়া গ্যাচেন তিনি। শনি (৩০শে মে)- রবি আজ সোম- আমাদের মেয়েছেলেরা রান্দন- বারি করেনি, চুলায় হাঁড়ি চড়েনি। গাঁও সমেত কান্দাকাটি!

তাকে বলা হলো, কেঁদে কি করবে তোমাদের যেভাবে তিনি কাজ করে যেতে বলেছেন, সেই ভাবে কাজ করো।

- কাঁদবোনা যে বাবা, দেখে যান- বলতে বলতে জোনাব আলী একটি উঁচু ভিটেয় নিয়ে গেল। তারপর সামনের জমি দেখিয়ে বললো- এই জমি আগে একিবারে অনাবাদী পড়্যা আছিল। জিয়া সাহেব আ'সে দেখে বললেন এখানে আবাদ করতে। আমরা হাসলাম। এ জমির মাটি যেমন খারাপ তেমনি নানারকম অসুবিধা, পানির অভাব। যাইহোক তাঁর পরামর্শ মতন সার দেওয়া হলো, পানির পাইপ দিয়া পানি স্যাচা- সব হলো। পয়লা পয়লা বিঘা প্রতি দুই মন আড়াই মণ ফসল পাওয়া যা'তো। এ্যাকন বিঘা

www.pathagar.com

প্রতি দশ মণের কম নয়। জিয়া সাহেব খাড়াইয়া থ্যাকা করাইছেন। আরো কতা- এ্যাকন এক ফসল তুলি, আরেক ফসল দেই। উনি বললেন, সামনে ফসলের সময় আসপেন। ... বলেই জোনাব আলী হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

চোখ মুছে বললো- আমার গাঁয়ের ছোয়াল পোয়ালেক ডাক দেই। তাদের সাথে কথা কয়া যান। দ্যাকেন অরা কি কয়! বউ-ঝিরা কি কয় শোনেন! বউ-ঝিরা হাঁস-মুরগী, বকরী পালে, খ্যাতা সিলাই করে, খাজুর পাতা নারকেল পাতা দিয়া পাটি সিকা বানায়, আচার বানায়, খাজুর পাতার আঁশ দিয়া টুপি বানায়। সমিতির থ্যাকা লোক আসে তারা দাম দিয়া কিনা নিয়া যায়। ... মেয়েছেলেদের এসুব কামের কত আগ্রহ যোগাইছেন!

সামনে ফসল উঠলে আবার আসবো- কথাটি প্রেসিডেন্ট অনেক গাঁয়ের কৃষকদেরই বলেছেন।

সারা দেশের সব শ্রেণীর মানুষের প্রাণের মানুষ জিয়া। সাধারণ মানুষ যেন তাদের অরাজক প্রাণে একজন রাজা পেয়েছিলো। সেই তাঁকে হারিয়ে তারা মাতম করে কেঁদেছে। পরনে গেঞ্জি অথবা ছেঁড়া পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, খালি পা-তারা এসেছে গ্রামান্তর থেকে ছুটে তাদের সেই নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা, ভালবাসা নিবেদনের জন্যে। আহা, যদি তারা একবার শেষবারের মত তাঁর মুখখানা দেখতে পেত! কিন্তু মুখ দেখানো সম্ভব হয়নি। তারা কেঁদে উঠেছে বার বার। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের শোকবাণীতে বলেছেন, বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা, তৃতীয় বিশ্বের একজন বিপ্লবী সাংগঠনিক নেতা, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

জিয়া আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। জিয়া আধুনিক সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। নারী সমাজকে স্বনির্ভর করতে চেয়েছিলেন- অর্থনৈতিক দিক থেকে। মেয়েদের যোগ্যতার পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে এ্যামবেস্যাডর পুল গঠন করেছিলেন, তার ভেতরে মহিলার নামও অন্তর্ভূক্ত করেন। কেউ কেউ এক্ষেত্রে আমাদের মেয়েদের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলে তিনি জবাব দেন- চেয়ার মেক্স্ ম্যান। আপনারা পারলে শিক্ষিতা মেয়েরাও পারবেন। তাদের সে ক্ষমতাতো যাচাই হয়নি!

তাঁর বুক ভরা কেবলি আশা ছিল সব মানুষের জন্যে। তারই প্রতিফলন ফুঠে উঠতো মুখে। তাই সেখানে হতাশার চিহ্ন ছিল না। 'হতাশ হবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ'- অনেক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলতেন। দেখা গেছে ঠিক হয়েও গেছে সময় মতো।

তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাছে যেন আশা করা যায় না। অথচ যেখানেই তিনি গেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন বিশাল দেশসমূহের রাষ্ট্রপতির সামনে তিনি সমান ব্যক্তিত্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সমান আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আলাপ-আলোচনায়, কথা, ভাব-ভঙ্গিমায়। তীরের মত একটি দেহ,

www.pathagar.com

তার ঋজুতা এবং গতিময়তাও তেমনি। নির্ভীক সৈনিক, প্রাজ্ঞ রাজনীতিক, আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেমিক মানুষ, নিষ্কলুষ চরিত্র, জীবনযাত্রায় সাধারণ- দেশের সব মানুষের প্রতি সমান আগ্রহী। এই ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া।

সারাদিন, সারারাত- কাছে-দূরে বহুস্থানে তাঁর উপস্থিতি, হাতে-কলমে বহুকাজ, অনুষ্ঠান, আলোচনা-বক্তৃতা বিদ্যুতের মত গতিমান তার কর্মীসত্ত্বা- কিন্তু কখনো তিনি হন্তদন্ত নন। এক ফোঁটা টেনশন নেই। সুগভীর আত্মপ্রত্যয় অসীম ধৈর্য এবং আবিশ্বাস্য নির্লিপ্ততা।

দেশের মানুষ তা বুঝেছিলো। অন্তরে অন্তরে চিনেছিলো তারা তাঁকে। সেদিন একজন তরুণ ডান হাতখানা নিজের বুকে বুলিয়ে নিয়ে বললেন- এই হাতে এখনো যেন তাঁর স্পর্শ লেগে রয়েছে। তরুণ একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি জানালেন যে, তাঁর দুঃখ ছিল মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জিয়াকে তিনি কখনো কাছে পাননি, হাতে হাত মেলাতে পারেননি। কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট জিয়া এক মফঃস্বল শহরে ট্যুরে গিয়েছিলেন। শহরের রাস্তা ঘুরে তাঁর গাড়ি এগিয়ে চলছিলো। দু'ধারে অগণিত জনতার ভীড়। তাঁকে হাতে হাত ধরে কর্ডন করে ঠেকিয়ে রাখছিলো সরকারী লোক, পার্টির লোক, গণ্যমান্য শহরবাসীরা। সেই কর্ডনের পাশে এক জায়গায় এগিয়ে এলো সেই তরুণটি। প্রেসিডেন্টের গাড়ি কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ দুইহাতে কর্ডন ছিন্ন করে জীপের সামনে লাফিরে পড়লো। জনতার দিকে হাত নাড়ছিলেন প্রেসিডেন্ট- সেই হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরলো তরুণ। নিরাপত্তারক্ষীরা এবং জনতাও মুহূর্তের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো। গাড়ি থেমে গেছে। প্রেসিডেন্টের চোখে নিবদ্ধ তরুণের চোখ। কয়েক সেকেন্ড- বেশ জোরে জোরে চাপ দিয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো তরুণ। গাড়ি এগিয়ে গেল। আজো সে তার সেই হাত মাঝে মাঝে বুকের ওপরে চেপে রাখে।

আগেই বলেছি প্রেসিডেন্ট নারী সমাজের কথা চিন্তা করতেন। তিনি এ দেশের অবহেলিত নারী সমাজকে শ্রদ্ধাই করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সঠিক মুল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দানে অগ্রসর হয়েছিলেন।

একজন মহিলাকে বলতে শুনেছি- আমরা দেখেছি তিনি তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তিনি মেয়েদের এইভাবেই সম্মান দেবার একটি অনুপ্রেরণা বোধ করতেন হয়তো অন্তর থেকে। নারী সমাজ যে দেশের একটি শক্তি- এটা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। দেশের সেই শক্তির যে অপচয় হয়েছে আজ পর্যন্ত, সম্ভবতঃ খুব অল্প সময়ে খুব দ্রুত তালে তিনি সেই অপচয়ের ক্ষতি পুরণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁদের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। ফল হয়েছে তাতে, তার প্রমাণ রয়েছে দেশের শহরে, বন্দরে, গ্রামে।

সব শেষে বলবো, জীবনকে এইভাবে পরিচালনার জন্যে তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়ার

www.pathagar.com

সহযোগিতা ছিল অনেক। তাঁর স্বামী যে অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষের অতি সাধারণ জীবন যাপন করছিলেন, প্রেসিডেন্ট পত্নী তাতেই সায় দিয়েছেন। সুখী হয়েছেন। এক জন পুরুষের জীবনে নারীর সহধর্মিতা সহমর্মিতা অনেকখানি প্রয়োজন। খালেদা জিয়া সেখানে সফল। তাঁর দুই ছেলের জীবনযাত্রাতেও তিনি কোন অন্যায় প্রশ্রয় দেননি। দেশ-বিদেশে গেছেন শপিং সেন্টারে গিয়ে সৌখিন দ্রব্য কেনাকাটা করেছেন ব'লে জানা যায়নি। স্বামীর সঙ্গে বিদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে খালেদা জিয়া যেসব উপহার পেয়েছেন সেগুলো নিজের সম্পত্তি বলে মনে করেননি। রাষ্ট্রীয় ভবনের তোষাখানায় গচ্ছিত রেখেছেন।

আমরা দেশের নারী সমাজ মরহুম প্রেসিডেন্টের ইন্তেকালে শোকার্ত হয়েছি, কেঁদেছি বিলাপ করে। এই সঙ্গে আমরা যেন এই শপথ নেই- নিজেদের এবং সন্তান সন্ততির জীবনে জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়িত করবো। জীবনযাত্রা কতটা সহজ, সরল ও বিলাসহীন করা যায় সততার সঙ্গে সে চেষ্টাও অনুশীলন করবো।

আমরা প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাধারণ জীবন যাত্রার কথা জানতে পারছি ধীরে ধীরে। তাঁর প্রতি যদি আমাদের সত্যিকার শ্রদ্ধা ভালবাসা থাকে, তবে তাঁর আদর্শ জীবনযাত্রার প্রতিও আমরা হবো শ্রদ্ধাবান। আমরা চাইবো আমাদের সন্তানেরা এক একজন জিয়া হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

উপেক্ষিত একটি প্রতিভা | শহীদ সাবের

২৫শে মার্চের পর থেকে দীর্ঘ এক বছর ব্যাপী নৃশংসতা কবলিত কত ঘটনা, কত খ্যাত-অখ্যাত নাম, কত ছবি ছাপা হলো, কত জীবনী লিপিবদ্ধ হলো পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের কাগজে পত্রে অথচ একটি উল্লেখযোগ্য নাম- যে নামের জীবনকথা কোথাও প্রকাশ পেল না। কেউ তার সম্পর্কে আলোচনা করলো না- কোন শোকসভায় তার নাম বিশেষভাবে উচ্চারিত হলো না।

কিন্তু তার নাম তো ভুল হবার কথা নয়। সে একজন তরুণ প্রতিভাবান সাহিত্যিক, একজন সাংবাদিক। এছাড়া পরবর্তীকালে সে তো সবার চোখের ওপর দিয়েই চলা-ফেরা করেছে। বরং তাদের দৃষ্টিতে বিদ্ধ হতো তার গতিবিধি। প্রায়ই তাকে দেখা যেতো রাস্তার পাশ দিয়ে আনমনে হেঁটে যেতে। কখনো দেখা যেত ফুটপাতে অথবা রাস্তার একধারে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট হয়ে কিছু ভাবতে। ডান হাতের ওপরে থুতনির ভার রেখে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো সে। যেন, সে আর তার ভাবনা ছাড়া চারপাশে কেউ নেই, কিছু নেই। হয়তো দুপুরের প্রখর রোদ মুখের ওপরে মাথার ওপরে পড়ে মাথা মুখ জ্বালিয়ে দিচ্ছে- তবু বোধ নেই!

বিশেষ করে বিদগ্ধ পরিবেশের আশে পাশে তাকে দেখা যেত বেশী। সংবাদপত্রের অফিসে তাকে দেখা যেত প্রায়ই। কিন্তু ধীরে ধীরে এই পরিবেশে সে হয়ে উঠেছিলো অবাঞ্ছিত। তার সারা শরীর তখন এক দুর্গন্ধ ছড়াতো। পরণে শতছিন্ন ময়লা জামাকাপড়। হাতে পায়ে নোংরা নখ। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, মাথায় বড় বড় উস্‌কো খুস্‌কো চুল। কতদিন যে সাবান তেল পানি এমন কি চিরুনী পড়েনি কে জানে!

আসলে সে খবর নেবার মত আপন জন তার কেউ নেই। তার চার পাশে হৃদয়বান লোকের অভাব ছিল না, তবু তার বন্ধু ছিল না কেউ। কত সংস্থা, কত বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠান কিন্তু কেউ তার সাহায্যের জন্যে হাত বাড়ায়নি। তাদের দৈনন্দিন অগ্রগতির পথে সে এসে দাঁড়ালেই সবাই তার উপস্থিতিতে শ্বাসরুদ্ধ ক্লান্তি অনুভব করতো। তাকে এড়াতে পারলে তাকে সরিয়ে দিতে পারলে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতির হাত থেকে বেঁচে যেত।

তার উপস্থিতি কেউ পছন্দ করেনি, অসহ্য বোধ করেছে। তার কারণ, তার মাথার চুল অপরিষ্কার, তার মুখমন্ডল অপরিষ্কার, তার দাঁত অপরিষ্কার, তার ছেঁড়া জামা কাপড় অপরিষ্কার। তার দেহ থেকে শুধু দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। সুতরাং তার উপস্থিতি তো সুখকর হতে পারে না!

প্রকৃতপক্ষে সে হয়ে উঠেছিলো একটি ডাস্টবিনের মানুষ। এই নিয়ে অবশ্যি তার জন্যে সবাই খুব দুঃখিত হতো। সে যখন চলে যেত তখন অত্যন্ত দুঃখিত কণ্ঠে সবাই বলতো, ''এ কি চেহারা হয়ে উঠছে ওর দিন দিন!' তারপর দর্শনজ্ঞান লব্ধ ভাষায় বলতো, 'এটা

www.pathagar.com

কি এক ধরনের পারভারশন, অথবা স্যাডিস্ট মনোভঙ্গির লক্ষণ!' না হলে নিজেকে এ্যাতো ছোট করতে পারে মানুষ! বিশেষ করে ওর মত এমন ইনটেলেকচ্যুয়াল ছেলে!'

সবার ধারণা ছিল, সে সম্পূর্ণ এ্যাবনরমাল হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সে বদ্ধ পাগল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যেন প্রাণপণ চেষ্টা করতো তা না হতে। তাই বুঝি সে কখনো কখনো কবিতা লিখে তার মৃত মনের গাঙ্গে জোয়ার জাগাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতো। সম্বিতময় হতে চাইতো।

কালচক্র ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলেছে। তার বুকে বাসা বেঁধে পৃথিবী কত রূপে মধুর মনোরম হয়ে ওঠে। সবার জন্যে কত মঙ্গলের আয়োজন সেখানে। কিন্তু সে যেন অনুভব করে জগতের কোন মঙ্গল শঙ্খ তার জন্যে নয়। তার মঙ্গলের জন্যে তা বাজে না। প্রিয়া-প্রিয়তমার হৃদয় রুদ্ধ কোমল আবেগে থর থর, অথচ তার এই তারুণ্যের তারা কেউ নয়! সে সব বুঝতো। বুঝে, শুনে এলোমেলো ভাষায় বাক্য রচনা করতো। কখনো সে কথাগুলো সবাইকে বোঝাবার জন্যে গুছিয়ে লিখতেও চেষ্টা করতো।

মাঝে মাঝে ধোপদুরস্ত পোশাকে সে নিজেকে সাজিয়ে উপস্থিত করতো সবার সামনে। সেদিন ভাল করে হাসতো ভাল করে কথা বলতো। সে তার বন্ধু স্বজনদের প্রতিশ্রুতিও দিতো, সে গুছিয়ে গাছিয়ে চলবে, আর নোংরা হয়ে থাকবে না। কিন্তু আবার কিসের এক তীব্র অভিমানে সে তা থাকেনি।

কিন্তু কেন সে এমন করে, কেন সে ভাল হয়ে সুস্থ হয়ে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তেমনি ভাবে চলতে পারে না- সে খবর কেউ কোনদিন নেয়নি। আসলে তার জন্যে কারো কোন দায়িত্ববোধ ছিল না। কেউ হয়তো দু-চার টাকা, দু একটি কাপড় জামা দু একদিন খাবার অথবা সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়ে করুণা করেছে। কিন্তু শহীদ কি এমনিভাবে শুধু করুণার পাত্র! এ যে তার অবস্থার কোন প্রতিকারই নয়, এই সহজ উপলব্ধি নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। তাই তার রোগ নিরাময় নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথাও ছিল না। কিন্তু সে দায়িত্ব ছিল সমাজে কাদের?

মাঝে মাঝে বিদগ্ধ মহলে তার বন্ধু অথবা শ্রদ্ধাস্পদ কেউ তাকে সামনে পেয়ে অবলীলায় প্রশ্ন করতো, 'কেমন আছো শহীদ?'

সে চোখ না তুলে এক পাশে মাথা হেলিয়ে অস্পষ্টভাবে বলতো, 'ভাল'।

এ প্রশ্নে হয়তো তার অন্তর বিধাতার ঠোঁটের প্রান্তে তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত ঝিলিক দিয়ে উপচে পড়েছে হাসি। কেননা, শহীদের দুপায়ে ছিল সেদিন দু রংয়ের দুটো স্পঞ্জের স্লিপার। একটির ফিতা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সে স্লিপারের আবার অর্ধেকটা ক্ষয়ে যাওয়া। প্যান্টের একটি পা প্রায় হাটু পর্যন্ত গুটানো, গায়ে শার্টের একটি বোতামও নেই, অথবা লাগানো হয়নি। পকেট ছিঁড়ে ঝুলছে। গলায় একটি ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো মাফলারের মত করে জড়ানো। তারপরেও কি জানতে ইচ্ছা জাগে তার কুশল!

সুতরাং সে যথার্থ উত্তরই দিয়েছে- 'ভাল।'

শহীদ কারো দিকে চোখ তুলে মুখ তুলে তাকাতো না। না তাকিয়ে, না তাকিয়ে দৃষ্টি তার নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলো। দীর্ঘ দশ বছর কি তারও আগ থেকে তার এই অস্বাভাবিক এবং অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা চলছিলো। মানসিক ভারসাম্যের ওঠা-পড়া চলছিলো। কখনো তা নিয়ন্ত্রিত হয়নি বা কেউ পর্যবেক্ষণও করেনি। প্রায় এই দশ বছরের ভিতরে সে মাঝে

www.pathagar.com

মাঝে কিছু কিছু লিখেছে। কাব্য রচনায় মানসিক একাগ্রতা প্রয়োগের চেষ্টা করেছে। তার এমনি একটি কবিতা-

বেশ ভাল জীবন

কি সুন্দর সকাল
শীতে
অপূর্ব এই নগরীর পরম
আরামের বাসগৃহগুলি
আমায় দিয়েছে শান্তি
যেন আমি যা চাই
তাই পেয়েছি
আর ব্যস্ত নয়
আমার দিবস যামিনী।
কথারা পেয়েছে মুক্তি
সঠিক অর্থ পূর্ণতায়
সুনির্দিষ্ট জীবনের
অপার মহিমা
এখানে পৃথিবীর
সব পথ ঘাট জানা আছে
জীবনের মত অগাধ বিশ্রাম
আমি আর
কোথাও যেতে চাই না
কবি স্বভাবের জন্যেও নয়।
হয়তো খ্যাতির মিনার
বলতে যা বুঝায়
এ হয়তো তাই,
অপেক্ষা রাখে না অন্য কোন জীবনের
বেশ ভাল জীবন।

আরো একটি কবিতা-

আশা করি অনেক কিছু

আজও নয় কালও নয়
এমন একটি সুন্দর শুরু
কাছাকাছি
ভাল লাগবার মত
অনেক কিছু ছিল,

www.pathagar.com

তবু
মনে মনে
ভেবে দেখেছি
হয়তো ওদিকে
নতুন কোন
সম্ভাবনার ইঙ্গিত।
কি আশ্চর্য
এই মুহূর্তে মনে হয়,
আমার
কাছাকাছি পৃথিবী
কি অদ্ভুত
ভাল লাগবার মত।

কবিতাগুলো কি তার হৃদয়ের সন্ধান দেয় না! মনের রূপ, রঙ, আশা, আনন্দ, প্রত্যাশা, বাসনা প্রকাশ করে না! তার দু-একটি কবিতায় দেখেছি, সুন্দর শব্দ চয়ন কিন্তু ভাবের অসংলগ্নতা।

শহীদ কতজনের সান্নিধ্যে এসেছে। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও শান্ত শিষ্ঠরূপে কতজনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কখনো অশান্ত বা উচ্ছৃংখল হয়ে কাউকে বিরক্ত করেনি, অসন্তুষ্ট করেনি। তবু তো কেউ তাকে স্মরণ করলো না! প্রকৃতপক্ষে শহীদ আমাদের কেউ নয়, আমরাও তার কেউ নই।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১-এ যে নির্মম নৃশংসতার সূত্রপাত হয়েছিলো দেশে, নৃশংসতার শিকার হাজারো মানুষের নির্মম মৃত্যুতে যখন মাতম করে কাঁদছি যখন ভয়ে ত্রাসে, যন্ত্রণায় বিভীষিকায় মানবিক সত্ত্বা হারিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে মানবিক অনুভূতি কোন অতলে যাচ্ছে তলিয়ে তখন সেই কঠিন মুহূর্তেও যখন কানে এলো সংবাদ অফিস পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে, আর সেই আগুনের আহুতি হয়েছে প্রতিভাবান লেখক এবং পরবর্তী কালে উম্মাদ শহীদ সাবের, তখনি যেন নিজের অজান্তেই বলে উঠেছিলাম, 'জালেমরা এই দেশের এই একটি মাত্র উপকার করলো!'

অবশ্যি তার এমন কোন আপনজন হয়তো নেই, যে আমার এই মন্তব্য শুনে ডুকরে কেঁদে উঠবে- নিদেন পক্ষে শিউরে উঠবে!

www.pathagar.com

অবসিত বেদনা | কবি মেহেরুন্নেসা

একটি তরুণ, কৃশ উদাসীন, বিষন্ন, আশাবাদী, দুনিয়ার প্রতি অভিযোগময় বিব্রত, সুন্দর, ক্লান্ত মুখ মাঝে মাঝে আমার সামনে উপস্থিত হতো। ঘরে ঢুকে চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে হাত তুলে অভিবাদন জানাতো।

সামনের চেয়ারটিতে বসে কুশল প্রশ্ন করতো- কেমন আছেন আপা?

ক্লান্তিতে ম্লান মুখ, চোখের দৃষ্টি ঠিক যেন স্বচ্ছ নয়, কেমন ঘোলা ঘোলা। পাতলা ঠোঁট দু'টি অত্যন্ত শুকনো। জিজ্ঞেস করতাম, অনেকক্ষণ বেরিয়েছো?

ও বলতো, সেই সকালে। অফিসের গাড়ি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো সেই সুযোগে নেমে পড়লাম। একদম সময় পাই না আপা! সকাল আটটায় আসি আর ফিরি পাঁচটায়।

তারপর অনেক কথা বললো। ওর অফিসের পরিবেশ, ওর কাজের ধরন, নিয়ম কানুন, সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি।

অনেকদিন আগে একবার ওকে বলেছিলাম, তুমি লেখা পড়া শুরু কর আবার। ও একটু হেসে ওদের সংসারের সব কাহিনী বললো। বললো, অসুস্থ বাবা, ভাইরা ছোট, ওরা লেখাপড়া করে। উপার্জন করবার কেউ নেই আর। কোথাও কোন আয়ের পথ নেই। সুতরাং...

মেহেরুন্নেসা, কবি মেহেরুন্নেসা বলেই পরিচিত। তার কবিতা ভাল কি মন্দ, তার প্রতিভা অসাধারণ কি সাধারণ সেটা পরের কথা। তার একটি কবি মন ছিল এবং তার কবিতা শুধুমাত্র ভাব বিলাসকে প্রশ্রয় দেয়নি। কাব্য বিলাসের অবকাশ হয়নি তার জীবনে। যে বিষয়টি সেখানে লক্ষ্য করবার, তা হচ্ছে তার চিন্তা ভাবনা এবং বক্তব্যে সিরিয়াসনেস এবং প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা।

যে বয়সে একটি শিল্পীমন রোমান্টিকতার আমেজে মেতে ওঠে, সেই বয়স পাবার আগেই তার ছোট্ট মন সংসারের অভাব অনটন সমস্যার চাপে নিষ্পেষিত হয়েছে। জগতের কঠিন বাস্তবরূপের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে। তার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কত আশা আকাঙ্খা, সাধ-বাসনা স্বপ্ন-সম্ভাবনা, চাওয়া-পাওয়ার সুন্দর কল্পনা শুকিয়ে গেছে একে একে। ঝরে গেছে। সে তাকিয়ে দেখেছে কেবল। তবু বলতে হয় এ সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও সে তার শিল্পীমনকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তার প্রতিভার আসল পরিচয় সেখানেই। সেটাই তার কৃতিত্ব।

ও এসে বসতো আমার সামনে। অনেক কথার পরে বিনা ভূমিকাতেই বলতো, আপা,

www.pathagar.com

কবিতা এনেছি আপনাকে দিতে। একটি ভাঁজ করা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিত। তারপর এ নিয়ে একটি কথাও বলতো না আর। প্রকাশ হতে দেরী হলে হয়তো ডাকঘরের সীল মারা একটি খাম এসে উপস্থিত হতো। তার ওপরে লেখা থাকতো- 'স্থানীয়'।

ওপরে ঠিকানা লেখার হস্তাক্ষর দেখেই বুঝতে পারতাম কে লিখেছে এবং ভেতরে কি লেখা আছে।

খুব করুণ মনে হতো চিঠির কথাগুলো। ওর কচি স্নিগ্ধ মুখখানার সঙ্গে চিঠির সে কথা গুলো মেলাতে গেলে ভারী কষ্ট হতো। ও লিখতো... লেখা প্রকাশের আনন্দের চাইতে আর্থিক দিকটাই আমাকে বেশী প্রলুব্ধ করে।... আপনি তো সবই জানেন।

কারখানায় চাকরী করতো মেহেরুন্নেসা। কারখানার গাড়ি ওকে তুলে নিয়ে আসতো বাসার কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে। গাড়ি বাসা পর্যন্ত যেতনা। তারপর বিকেলে আবার সেখানেই নামিয়ে দিয়ে আসতো। বাড়ি থেকে অতটা পথ রোজ হেঁটে এসে সে সেখানে অপেক্ষা করতো দাড়িঁয়ে দাঁড়িয়ে। বিকেলে ওখান থেকে বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। শীতের দিনে রাত হয়ে যেত।

এখানে চাকরী পাবার আগে নকল নবীশীর কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে হয়েছে তাকে। ওর সম্বন্ধে ভাবতে গেলে মনে হয়, নিষ্ঠুর হানাদারদের হাতে সে শহীদ হয়েছে, কিন্তু ও যদি বেঁচে থাকতো তবে কি তার প্রতিভা কোন দরদী মনের সংস্পর্শে লালিত হতো নতুন করে। কেবলি মনে হয় আসলে ও যেন আগে থেকেই নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। ওর প্রাণ প্রাচুর্যে ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছিল।

ওর সেই কণ্ঠস্বর যেন এখনো শুনতে পাই। অত্যন্ত সংকোচভরে সে বলতো- আমার লেখার বিলটি কি হয়েছে?

এর কোন জবাবের আগেই সে কথা শুধরে নেবার মত করে একটু জোরে বলে উঠতো- অবশ্যি ঠিক আছে। আপনার সুবিধামতই করবেন। আমি এই দিকে এসেছিলাম, তাই খোঁজ করলাম।

এক সময় ও উঠে দাঁড়াতো শেষ অভিবাদন জানিয়ে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে।

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, ওর দু'চোখের দৃষ্টি যেন আশাহত হয়ে থির থির করে কেঁপেছে। ওর পথ চলা কেউ লক্ষ্য করলে দেখতে পেত, কত ভারাক্রান্ত ওর গতি।

বহু আশাভঙ্গের বহু কষ্ট ওর হৃদয়কে যেন কুরে কুরে খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল।

যৌবনের তারুণ্য তখন তার জীবনে। আমাকে একজন বলেছিলেন, মেহেরুন্নেসার সম্বন্ধে আমি কতটুকু জানি। কনে হিসেবে তাকে এ্যাপ্রুভ করি কি না।

বলেছিলাম- হৃদয়ের ঐশ্বর্য আছে, একটি সরল শিল্পী মন আছে মেহেরুন্নেসার। কেউ যদি তাকে বোঝে, এ্যাপ্রিশিয়েট করে তবে খুব সুখী হবে ওকে নিয়ে।

কিন্তু বিয়ে ওর হয়নি। অভাবী এবং ভরসাহীন সংসারটিকে ফেলে সে নিজের বিয়ের

www.pathagar.com

কথা চিন্তা করতে পারেনি। এগোতে পারেনি সেদিকে। তার বাবার মৃত্যু হয়েছে তখন। সে স্বার্থপর হতে পারেনি। এইভাবে জীবনের কোন আশাই তার পূর্ণ হয়নি।

একটি কথা ভেবে এখনো বিস্মিত হই যে, উনিশশো একাত্তর সালের সেই হানাদারী আমলে সে অবাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে কিসের আশ্বাসে বাস করছিলো! মানুষ জন যখন ঘর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র সরে পড়েছে, তখনো তার মনে সেই সব মানুষদের সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগেনি। এটাও তার হৃদয় ঐশ্বর্যের একটি পরিচয়। জীবন দিয়ে যার খেসারত সে দিয়ে গেল। সে হয়তো ভেবেছিল, দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী যারা, তাদের কাছে কি বিপদে দুঃসময়ে সাহায্য সহযোগিতা পাবে না? আশ্রয় দেবেনা তারা?

কিন্তু তার সেই সহজ মানবিক বিশ্বাসের মর্যাদা-মূল্য কিছুই থাকেনি। ২৬শে মার্চ সে তাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

ওর সেই সুন্দর স্নিগ্ধ মুখখানা আমার স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে। সেখানে অবস্থান করবে ওর একটি সুন্দর প্রতিকৃতি।

www.pathagar.com

নিভে যাওয়া তারুণ্য | কবি আবুল হাসান

দুষ্টুমির জন্যে দুষ্টু ছেলেদের শাস্তি দিলে প্রায়ই তাদের বলতে শোনা যায়- আর করবো না কখনো... ঠিক তেমনি করে বলছিলো আবুল হাসান।

চলা-ফেরায় ও খুব অনিয়ম করতো। যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল সে, এমনি আচরণে স্বাস্থ্যের ওপরে খুব অত্যাচার হতো- ঝুঁকি পড়তো। কিন্তু হাসান হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অনেক কষ্টে উচ্চারণ করেছিলো- এবার ভালো হয়ে উঠলে আর নয়! উঃ! ... কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না।

পিজি হাসপাতালে ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। হাসপাতালের বিছানায় ও কেমন ছটফট করছিলো। অবশ্যি এমনিতেই ও অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির ছেলে। নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো অবস্থাতেই একবার উঠে বসছিলো, যদিও অন্যের সাহায্যে, আবার পা ঝুলিয়ে দিচ্ছিলো খাট থেকে নীচে। কখনো চিৎ হয়ে উঁচু বালিশে হেলান দিতে অথবা মাথা রাখতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু কোনটাই বেশীক্ষণের জন্যে নয়। এই ছট্‌ফটানি আদপেই ওর কষ্টের জন্যে না স্বভাব, ঠিক বোঝার উপায় ছিলনা তখন।

ঠিক সেই সময়চিতেও আবুল হাসানের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবা সহজ ছিল না যে, আগামী কাল প্রাতেই সে শরতের একটি শেফালীর মত টুপ করে ঝরে পড়বে। একটি তরুণ ছেলে- জীবনের শুরুই হয়নি যার পুরোপুরি- কেবল প্রাণ ভ'রে বাঁচার আনন্দ দু'হাতে লুটে নেবার সময় যখন, তখনি তার জীবনের অবসান হলো। তার যে সম্ভাবনাময় জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল তার পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল স্রষ্টার এবং এই ভাবে যতি টেনেই বা কোন্ উদ্দেশ্য সাধন হলো- কে বলবে!

আবুল হাসান স্রষ্টার উদ্দেশ্য- অনুদ্দেশ্যের সম্বন্ধে অবহিত হতে আগ্রহী ছিল কি না, সেটা আমাদের জানবার কথা নয়। শুধু এই বিশ্বাস আমাদের যে, সে প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা করেছিলো। সে মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা লড়েছে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের কাছে দোয়া চেয়েছে- যেন সে সেরে ওঠে- আবার যেন সুস্থ হয়ে ওঠে।

এর আগে তাকে বাংলাদেশ সরকার বিদেশে পাঠিয়েছিলো উন্নতমানের সুচিকিৎসার জন্যে। যে চিকিৎসা আমাদের দেশে হওয়া সম্ভব নয়। আবুল হাসান সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু ব্রাকেটে উল্লিখিত ছিল ডাক্তারের সাবধান বাণী- অত্যন্ত নিয়ম কানুনের মধ্যে থাকতে পারলে কমপক্ষে বিশ বছর সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে।

কিন্তু বাঁচার সত্যিকার অর্থের সঙ্গে নিয়ম লংঘনতো ওতপ্রোতভাবে জড়িত! তাই তার

www.pathagar.com

নিজস্ব একটি জীবন দর্শন অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে হাসান। তার সে জীবন দর্শন স্বজন এবং বন্ধুদের কাছে যত অনভিপ্রেতই হোক!

মানুষের দেহের প্রতিটি রক্ত কণিকার বুকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়- মরিতে চাহিনা আমি...। মরিতে চাহিনা আমি... জগতের ছোট বড় দীন দরিদ্র, রাজা মহারাজা সবার অন্তরেই অনুরণিত এই আকূতি। হাসান আরো একবার যখন এই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিল, বিদেশে চিকিৎসার ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। হয়তো ভেবেছিলো এবারও সুস্থ হয়ে উঠবে। আবার আগের মতই এখানে, সেখানে, বন্ধু-বান্ধব মহলে, পত্র-পত্রিকা অফিসে, হোটেলে, রেষ্টুরেন্টে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমাবে।

আবার হয়তো ভেবেছিল, এবারের আক্রমণে দৈহিক ভাবে তাকে পঙ্গু অধম জীবন কাটাতে হবে। তাই মায়ের মুখ কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল- মা, তুমি আমাকে সেই তোমার শিশুটির মত করে পালতে পারবে না- আমি তোমার সঙ্গে দেশের বাড়িতেই থাকবো!...

ওর মার মুখেই এই কথা শুনেছিলাম আমি। হাসপাতালে হাসানের বেডের সমান্তরাল আরো একটি বেডে থাকতেন হাসানের মা। আমি যেতেই হাসান দুর্বল একটি হাত তুলে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখিয়ে বললো- আমার মা!

তাঁর পাশে গিয়ে যখন বসেছিলাম, তিনি অনেক কথা বলেছিলেন আমার সঙ্গে। বলেছিলেন- এই আমার প্রথম সন্তান। ... ওর জন্যে আমি মাজারে বাতি দিয়েছি। আজ ক'জন মওলানা ঠিক করিয়েছি কোরআন খতম দেব। ... ফকির মিসকিনের ভেতরে সিন্নি বিলিয়েছি।

মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যায় হাসানকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই প্রথম এবং সেই হলো শেষ। কিন্তু তখন তাকে মনে হয়নি সত্যি সত্যিই মৃত্যুপথ যাত্রী। বরং মনে হয়েছিলো, হাসান সেরে উঠবার পথে। ওর মা বললেন... অক্সিজেন কখনো কখনো খুলে রাখা হয়। তার অর্থ সব সময়ের জন্যে তার শ্বাসকষ্ট থাকে না। মাঝে মাঝে হয়, আবার মাঝে মাঝে বিনা অক্সিজেনেই চলে।

আমি যখন কেবিনে ঢুকি, দেখি, হাসানের মাথায় বাতাস দিচ্ছে একজন তরুণ ছেলে- বন্ধু অথবা আত্মীয়- একটি ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে। জিজ্ঞেস করেছিলাম- হাত পাখা নেই?

ওর মা বললেন, হাত পাখা কেনার জন্যে পাঠানো হয়েছিল- পাওয়া যায়নি। শীতের দিনতো! সেই জন্যেই হয়তো বাজারে নেই এখন।

হাসানের কেবিন আমার কাছে বলতে গেলে অপরিচিত একটি পরিবেশ। সেই দিনই আমি প্রথম গেলাম সেখানে। সেখানে উপস্থিত তার মা, ভাই-বোন সবাই আমার অপরিচিত শুধু রোগী হাসানই একমাত্র পরিচিত।

ওর মাকে বললাম- কালই (বুধবার, ২৬শে নভেম্বর) একটি হাতপাখা পাঠিয়ে দেব। জিজ্ঞেস করলাম হাসান কি কি খেতে পারে।

www.pathagar.com

আজকাল ইলেকট্রিক পাখা ঘরে থাকলে, সেখানে হাত পাখার তেমন প্রয়োজন হয় না। অনেকে রাখেও না। যদি রাখা হয়, তবে সখ করে- একটি সৌখিন হাত পাখা। প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে নামানো হয় আবার যত্ন করে তুলে রাখা হয়। আমি সেই পাখাটি নামালাম। একটু খুলে গিয়েছিল এক জায়গায়- সেলাই করলাম। বিকেলে হাসানকে পাঠাবো কিছু কলা, কিছু বিস্কুট এবং একটি হাত পাখা, ওর জন্যে সাজিয়ে রাখলাম সব।

মঙ্গলবার ওকে দেখে চলে আসার সময় ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কপালে হাত রাখতেই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো হাসান- আমার জন্যে দোয়া করবেন আপা!

এখন ভাবছি, ওকি সামনে একটি অকূল পাথার দেখতে পেয়েছিল! ওর কি মনে হয়েছিল, এই অকূল পাথারের কোনও প্রান্তে এমন একটি ভরসা আছে, যেটা ধরা-ছোঁয়া, জানা-অজানার উর্ধ্বে! দোয়া সেখানে গিয়ে পৌছাতেও পারে! অসুস্থ ক্লান্ত তরুণ কবি আবুল হাসান কি বুঝতে পেরেছিল একটি ইঙ্গিত-

হোয়েন গুডনেস মেক হিম নট
ইয়েট ওয়্যারিনেস
মে টস্ হিম টু মাই ব্রেস্ট!

একজন বিদেশী কবির হৃদয়ের অপার্থিব অনুভূতির প্রকাশ এই লাইনগুলো। হাসানও কি এমনি এক অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলো!

হাসানকে আমি চিনি বেশী দিন নয়। 'দৈনিক বাংলা' অফিসে সে আসতো। সাহিত্য সম্পাদক কবি আহসান হাবীবের টেবিলের সামনে চেয়ারে এসে বসতো। কিন্তু এমন ভাবে ঘুরে বসতো ওর ডান দিকে আহসান হাবীব এবং বাঁ ধারে আমি। ও কথা বলতো খুব জোরে জোরে। ভঙ্গিতে প্রকাশ পেত একটি একগুঁয়ে এবং বেপরোয়া ভাব। হয়তো হৃদরোগের রোগী সে- একথা ভুলে থাকতে চাইতো। অথবা রোগটাকে পাত্তা দিতে চাইতো না জেদ করে। তাই বুঝি এমন জোরে জোরে নাকের শিরা ফুলিয়ে অনর্গল কথা বলে যেত। প্রাণবন্ত তারুণ্যের যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য, হাসানের মধ্যে তার সবটুকুই ছিল। তার ওপরে ছিল সে কবি- একজন শিল্পী।

পূর্ব জার্মানী থেকে ফিরে আসার পর ওকে প্রথম যেদিন দেখলাম, দেখলাম, শরীর একটু ভাল হয়েছে। কিন্তু মুখ শুকনো এবং চেহারা একটু উস্‌কো খুস্‌কো।

জিজ্ঞেস করলাম শরীর কেমন?

-শরীর ভাল। কিন্তু এসে দেখি চাকরী নেই। এখন তো আবার না খেয়ে মরার অবস্থা। একটি কথা প্রশ্ন করলে হাসান এই ভাবে আনুষঙ্গিক অনেক কথা বলে ফেলতো। এটা আরো লক্ষ্য করেছি। এটা ওর স্বভাব।

একদিন অফিসে এসেছিল সে। আমি জানতে চেয়েছিলাম ওর কাছে, পূর্ব জার্মানীর পরিবেশ এবং সেই দেশ সম্বন্ধে আরো কিছু। হাসান গড় গড় করে বলতে লাগলো, সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার খানাপিনা, লোকজন, সুবিধা অসুবিধা- সব বিষয়ে।

www.pathagar.com

এ ছাড়া এই সূত্রে সে কোথায় কোথায় গিয়েছে, কতক্ষণ কয়দিন কোথায় ছিল এবং আমি যদি শীত কাতুরে হই তবে আমার পক্ষে সে দেশে গিয়ে কিছুতেই টেকা সম্ভব নয়- ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

যে কোন একটি আনন্দকে সে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করতো। একদিন অফিসে গিয়েছি, দেখি আহসান হাবীবকে সে কি নিয়ে যেন খুব পীড়াপীড়ি করছে। ওর হাতে একটি 'ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ' সিগারেটের প্যাকেট। লেখার জন্যে একাগজ সে কাগজ মিলিয়ে কিছু টাকা পেয়েছে, তার থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে এনেছে। বলছিলো -এই সিগারেট আপনার জন্যেই এনেছি হাবীব ভাই!

- কেন এনেছো? কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বললেন আহসান হাবীব।

- আপনাকে দিতে ভাল লাগছে তাই।

শেষ পর্যন্ত স্নেহের দাবী মেনে নিতে হলো হাবীব ভাইকে। হাতে তুলে নিতে হলো প্যাকেটটি। প্রায়ই আমাকে চা খাওয়া নিয়ে অমনি পীড়াপীড়ি করতো সে। চায়ের পয়সা আমি দিতে গেলে হৈ-চৈ বাধাতো।

কবি হিসেবে হাসানকে আমি যতটা জেনেছি, তাতে মনে হয়, তরুণ কবি গোষ্ঠীর মধ্যে আবুল হাসান নিজেকে বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। তার কবিমন তার শিল্প সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততা তাই প্রমাণ করে। এছাড়া এদেশের মাটি, মাটির কাছাকাছি যে মানুষ তার সঙ্গে হাসানের নাড়ীর টান ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তাদের সঙ্গে অপূর্ব এক আন্তরিক যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায় তার কাব্যে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও আমরা কি ভেবেছিলাম যে এত দ্রুত তার প্রতিভা পরিমাপের শেষ সময় উপস্থিত হবে! আমরা শুধু লক্ষ্য করে আসছিলাম, প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবিদের মধ্যে আবুল হাসান অন্যতম। আমরা ভেবেছি একদিন বাংলা সাহিত্যে সে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর আসন লাভ করবে।

তবে দূর থেকে যাঁরা তার কবিতা পড়বেন, যাঁরা শুধু কবিতার মাধ্যমে তাকে জেনেছেন এবং জানবেন, আর যাঁরা তাকে দেখেছেন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে তাকে জেনেছেন- এই দুই জানার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে। ঘনিষ্ট যাঁরা তাদের সামনে কবি এবং কবিতা হয় পরস্পর পরিপূরক।

হাসানের সঙ্গে অথবা তার পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় এতটা ঘনিষ্ট নয়, যা থেকে তার সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত আলোচনা লেখা যায়। অনেকদিন হলো লক্ষ্য করছি, আমাদের কিছু সংখ্যক শিল্পী-সাহিত্যিক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, তাঁরা হাসপাতালে স্থানান্তরিত হচ্ছেন, সরকারীভাবে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে, সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন কেউ কেউ। ভাগ্যক্রমে কেউ কেউ সুস্থ হয়ে উঠছেন, কেউ কেউ পরিবেশকে শোকাচ্ছন্ন করে চলে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই ডাক এসেছে সময় মত, কেউ পেছেন অসময়ে। অনন্তযাত্রার সে ডাক মেনে নেওয়া খুব সহজ নয়।

কিন্তু কবি আবুল হাসান যেন ব্যতিক্রম। এত অল্প বয়সে এমন একটি কঠিন রোগের

www.pathagar.com

শিকার হয়েছিল সে। পৃথিবী ভরা এত বাতাস! তবু বুক ভরে বাতাসের অভাবে প্রাণ চঞ্চল তরুণ শিল্পী আবুল হাসান নিঃশেষ হয়ে গেল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে বাতাসের সঙ্গে যুঝে যুঝে শেষ পরাজয় মেনে নিলো সে বুধবার সকালবেলা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। ওর মা বলছিলেন... সারারাত জেগে থাকি, কি জানি...! পরের কথাগুলো মনে এলেও মুখে প্রকাশ করতে পারেননি তিনি। শুধু সারারাত অতন্দ্র থেকেছেন।

টাইম ইজ দ্য বেষ্ট হিলার। প্রার্থনা করছি- মায়ের বুকের ক্ষতে সময় তার প্রলেপ বুলিয়ে দিক। দ্রুত ক্ষত নিরাময় হোক।

চঞ্চল তরুণ কবির অসহায় রোগজীর্ণ মুখ, তার করুণ কণ্ঠস্বর- আমার জন্যে দোয়া করবেন। ...উঃ! এবার থেকে আর নয়...আর কোন অনিয়ম...

ওর জন্যে যে কলা, বিস্কুট পাখা গুছিয়ে রেখেছিলাম বুধবার বিকেলে পাঠাবো বলে, সেই প্যাকেটের ওপরে লিখেছিলাম-

কবি আবুল হাসান।

কেবিন নং ১২০, পি জি হাসপাতাল, ঢাকা।

www.pathagar.com

রোমান্টিক স্মৃতির বৃত্তে | নার্গিস

নার্গিস ইন্তেকাল করলেন। খবর সেই সঙ্গে তাঁর স্নিগ্ধ হাসি মুখের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হলো বিভিন্ন পত্রিকাতে।

এক সময়ে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনমনবরেণ্য চলচ্চিত্র শিল্পী ছিলেন নার্গিস। অগণিত দর্শক মনের শ্রদ্ধার্ঘ অর্জন করেছিলেন। নার্গিসের নামের সঙ্গে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি কমনীয় সতেজ দীর্ঘ সুমিতশ্রী তন্বী নারীমূর্তি। পাড়শূন্য সাদা-মাটা শাড়ি শরীরে জড়ানো। কখনো কখনো মাথার ওপরে টেনে দেয়া ঘোমটা। অপূর্ব এক ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি।

কৈশোর বয়স থেকে নার্গিসকে জানি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে- যখন সিনেমা প্রীতি সবে দানা বেঁধে ওঠে মনে। অভিনয়কে অভিনয় ভাবা যায় না তখন। অভিনীত হাসি কান্না আনন্দ বেদনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় দোল খায়। সেই সময় যত ছবি দেখতাম, তার অধিকাংশতেই থাকতেন নার্গিস নায়িকা। তখনি মনে হয়েছে তাঁর সমসাময়িক অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর কিছু তফাৎ রয়েছে এবং সেটাই ছিল তাঁর প্রতি আকর্ষণের কারণ। তাঁদের সঙ্গে চরিত্র চিত্রনের ব্যাপারেও তাঁর ছিল ব্যবধান। নৃত্য-গীত চঞ্চল নায়িকার ভূমিকা নার্গিস সম্ভবত এড়িয়ে যেতেন। হয়তো এর চপলতা তাঁর স্বভাবে ছিল না। অথবা খুব শালীন চরিত্রের অভিনয় তিনি পছন্দ করতেন বেশী।

অধিকাংশ শিল্পীদের জীবনের কিছু তুঙ্গ মুহূর্ত থাকে। শিল্প চেতনায়, শিল্প-সার্থকতায় উদ্বুদ্ধ থাকেন তখন তাঁরা অন্তরে বাইরে। নিজেকে সমৃদ্ধ করে সবার অন্তরে শিল্পের প্রতিফলন ঘটাবার একটি আর্তি থাকে তাদের মনে। নার্গিসের জীবনেও সেই মুহূর্তগুলো ছিল খুব স্পষ্ট। তখন হৃদয়ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এই শিল্পী অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন তাঁর শিল্পীসত্বাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।

অভিনয়ে নার্গিসের নিজস্ব একটি স্টাইল ছিল যাকে বলা হতো 'নার্গিসী স্টাইল'। আমরা সেই সময়ে বন্ধুদের সহপাঠিদের ভেতরে এই নিয়ে কত রসিকতা করেছি। বন্ধুকে বলেছি- নার্গিসী স্টাইলে হাসলে যে বড়! অথবা নার্গিসী স্টাইলে তাকানো, নার্গিসী স্টাইলে হেঁটে আসা, কথা বলা- ইত্যাদি।

নার্গিসের কতকগুলো ছবি যেমন, মেলা, আন্দাজ, বাবুল, দিদার, আওয়ারা ইত্যাদিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন দিলীপ কুমার। ছবিগুলোর প্রায় সব গুলোর কাহিনীই বিয়োগান্তক। গাঢ় রোমান্টিক প্রেম শেষ পর্যন্ত বিয়োগান্তক হয়েছে। দর্শক হৃদয় বেদনায় ঝুরেছে। বহুদিন মনে থেকেছে বেদনার সেই অনবদ্য স্বাদ। দিলীপ-নার্গিস

www.pathagar.com

তৎকালীন উপমহাদেশের সিনেমা জগতে প্রেমের সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী।

নার্গিস রাজকাপুরের সঙ্গেও বহু চিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু যেন মনে হয়, দিলীপ কুমারের সঙ্গে তাঁর অভিনয়ে জমেছে ভাল। দুজনের চেহারায় প্রতিফলিত চরিত্রের যে গাম্ভীর্য, অন্ততঃ দর্শকদের কাছে যেভাবে ধরা পড়েছে, তার ভেতরে খুব মিল আছে। যা রাজকাপুরের ভেতরে আমরা কম দেখেছি। এক একজন শিল্পীর এক একটি নিজস্ব রূপ থাকে। তাতে তাঁরা উত্তীর্ণ হন তাঁদের সার্থক সৃষ্টির মাধ্যমে কিন্তু মৌলিক জিনিসটি অত্যন্ত আন্তরিক দর্শক অথবা শ্রোতার চোখ এড়িয়ে যায় না। রাজকাপুর অপেক্ষাকৃত চঞ্চল অভিনেতা। দিলীপকুমার গুরু গম্ভীর। সুতরাং কাহিনীর ট্রাজেডী ফুটে উঠেছে দিলীপ নার্গিস জুটি অভিনয়ে বেশী।

নার্গিস মাত্র ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করলেন। বেদনার রানী ক্যান্সারের মত একটি দুরারোগ্য এবং যাতনাময় ব্যাধি ধারণ করলেন দেহে। তাঁর রোগ-যন্ত্রণা ভোগের এবং অকাল মৃত্যুর জন্যে আমরা মর্মাহত, শোকগ্রস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর ভেতরে কোথায় যেন একটি সান্ত্বনার সুর বাজে। মনে হয়- এই সুস্মিতা প্রাণময়ী শিল্পী জরা-বার্ধক্যের আওতার বাইরে। বার্ধক্য স্পর্শ করতে পারলো না তাঁকে। তার আগেই আনন্দিত যৌবনের মোহনীয় গৌরব নিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন। একটি রোমান্টিক স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকবেন তাঁর গুণগ্রাহীদের হৃদয়ে।

www.pathagar.com

একজন বিশিষ্ট মহিলা | নাজমা আতাহার

অফিসে এসে শুনলাম- নাজমা আতাহার মারা গেছেন। একটু চমকে উঠলাম- একটি ঋজু দেহ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মনে হলো- তাঁর কি মরার বয়স হয়েছিলো!

বেশ ক'দিন আগে নাকি কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ বেরিয়েছিলো, অথচ চোখে পড়েনি। ভারী দুঃখ হলো। এক সময় মাত্র যে ক'জন উচ্চশিক্ষিতা ও আধুনিকা মহিলার নাম উল্লেখ করা যেত, নাজমা আতাহার ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। শিক্ষায়তন ছাড়া অন্যান্য সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান মহিলারা যখন সবেমাত্র প্রবেশ করছেন, সেই কালে নাজমা আতাহার তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের একটি সংস্থার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে কাজ করে যাচ্ছিলেন। অত্যন্ত চটপটে, ব্যবহারে অমায়িক প্রত্যুৎপন্নমতির এই মহিলা আমাদের মহিলা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন দেশে এবং বিদেশেও।

তাঁর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হয়নি। কেবল দেখেছি দু'একবার। সংবাদপত্রে নতুন ঢুকেছি। কি একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্যে তৎকালীন 'পাকিস্তান কাউন্সিল'-এর তরফ থেকে একটি দাওয়াতপত্র পেলাম।

গিয়ে দেখি একটি কামরায় টেবিলে বসে রয়েছেন একজন মহিলা। স্লীভলেজ ব্লাউজ। কোন গয়নাপাতি নেই দেহে। মণিবন্ধে একটা ঘড়ি মাত্র। আর ডানহাতের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। সামনে এ্যাশট্রে। সিগারেট টানছেন মাঝে মাঝে, ছাই ঝেড়ে ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলছেন উপস্থিত অনেকের সঙ্গে।

দৃশ্যটি খুব দৃষ্টিকটু বোধ হলো। সংবাদপত্রে নতুন ঢুকেছি। ছদ্মনামে একটি কলাম লিখি। হাতে কলম আছে- লিখলাম চুটিয়ে। সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক আরো একজন মহিলার সম্পর্কেও ইঙ্গিত করতে ছাড়লাম না। অবশ্য বোধগম্য কারণেই কারো নাম উল্লেখ করিনি।

কলামটি পড়েই সম্ভবতঃ তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান অফিসে এসে হাজির হলেন- তিনি নন, দ্বিতীয় জন। প্রায় যুদ্ধংদেহি হয়ে ছদ্মনামের এই সাংবাদিকটি কে বলতে পারেন।

বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন সহকর্মী হাসান হাফিজুর রহমান। প্রায় দরজার ওপার থেকে বিদায় করার মত হাসান বলে দিলেন- উনি এখন অফিসে নেই। পরে আসবেন।

এরপর নাজমা আতাহারের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কোন প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠেনি তাঁর চোখে মুখে। সহজভাবে হেসে বলেছেন, খুবতো একটা মার দিয়েছেন। হাতে কাগজ আর কলমের ধার থাকলেই হলো! বিপক্ষের হাতে তো আর ওসব নেই! কি আর বলা!

www.pathagar.com

তাঁর চোখ দুটোতে ছিল বুদ্ধির দীপ্তি। যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। কথা আর বাড়াননি। এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যেন কত দিনের পরিচয়!

অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক সঙ্গীতের আসরে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে সীতানুষ্ঠানগুলো তিনি বুঝি বাদ দিতেন না কখনো।

বেশ ক'বছর আগে ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। সঙ্গীতানুষ্ঠান চলছিলো। শুনতে শুনতে বললেন, আপনার বড় মেয়ের গানের তো আমি একজন ভক্ত। আমার যদি একটি মেয়ে থাকতো, আমি তাহলে তাঁকে অবশ্যই গান শেখাতাম। বলতাম- তোমার কিচ্ছু করতে হবে না। শুধু খাও আর গান গাও। আমাকে বললেন, আপনি এদিক থেকে খুব লাকি! মেয়ের যত্ন নেবেন।

প্রশাসনিক পদে নাজমা আতাহার বরাবরই যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সরকারের গণসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয় তাঁকে।

তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ইন্তেকাল করলেন। আমাদের সমাজের একজন অগ্রগণ্য বিদুষী ও আধুনিকা মহিলার নাম নাজমা আতাহার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com